কাশ্মীরে জঙ্গিহানায় প্রাণ গেল ৪৯ জন সেনাবাহিনীর।
কেন্দ্রীয় সরকার এর রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ব্যস্ত

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

'উপরমহল'-এর নির্দেশে বন্ধ হল 'ভবিষ্যতের ভূত'
এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শিল্পী-কলাকুশলীরা

জানুয়ারি'২০১৯ ■ ৪৭তম বর্ষ ■ নবম সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাজেটে ভাঁওতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মচারীদের

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হয়। এর দুইদিন বাদেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ হয়। দুটি বাজেটই অন্তঃসারশূন্য এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে আরেকটি 'জুমলা' বলে বিক্ষোভ জানিয়েছেন রাজ্য কর্মচারীরা। বিগত ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে রাজ্যের সর্বত্র দপ্তরে দপ্তরে টিফিন বিরতিতে দুটি বাজেটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে শামিল হয় কর্মচারীরা। অধিকাংশ অফিসে ৭ ফেব্রুয়ারি এই বিশেষ কর্মসূচী হয়। কলকাতার ৭টি অঞ্চলের দপ্তরগুলিতে এবং প্রতিটি জেলার জেলাসদর থেকে ব্লক অফিসগুলিতে কর্মচারীরা স্বতস্ফূর্তভাবে এই কর্মসূচীতে শামিল হন।

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে গত ১ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করেছে। নামে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট হলেও এই বাজেটকে কেন্দ্রের শাসকদল আসন্ন নির্বাচনের রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। নানা "জুমলা"-য় ভরা এই বাজেট আসলে অন্তঃসারশূন্য, ভাঁওতায় ভরা। এই বাজেটে কৃষকদের দৈনিক ১৭ টাকা সহায়তা দেবার কথা বলে কৃষকদের সাথে মস্করা করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস হয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের তিরিশ বছর পর মাসিক বিশ হাজার টাকা করে পেনশন দেবার ঘোষণা ভাঁওতাবাজী ছাড়া কিছুই নয়। সর্বোপরি গত ৮, ৯ জানুয়ারি ২০১৯ দেশজুড়ে দুদিনব্যাপী ধর্মঘটে ২০ কোটিরও বেশী মানুষ শামিল হলেন যে ১২ দফা দাবিতে কেন্দ্র করে, সেই দাবিগুলির একটিরও সুরাহার কোনো দিশা নেই কেন্দ্রীয় বাজেটে। সামনে লোকসভা নির্বাচন তাই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ফুলঝুরি ছোটানো হচ্ছে। রাজ্য বাজেটও তথৈবচ। দাবি করা হয়েছে এই একটা ব্লকে নাকি ২০০ টা করে চাকরী হয়েছে। কোথায় চাকরী, কি চাকরী—কোন উত্তর নেই। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কোন দিশা নেই। সর্বোপরি রাজ্য বাজেটে ষষ্ঠ বেতন কমিশন বা মহার্ঘভাতা প্রসঙ্গে কোনো কথা নেই। অর্থাৎ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী হওয়ার কোন দিশা এই বাজেট দেখায়নি। এই সরকারের অধিকারগত ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রেখেছেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। রাজ্য কো-অর্ডিনেশান কমিটির নেতৃত্বে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা এই সরকারের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। দূরদূরান্তে নেতাদের বদলী করেও মাথা নোয়ানো যায়নি সংগঠনের। তাই বাজেটের নামে ভাঁওতাবাজির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সভায় আরও তীব্র আন্দোলনের শপথ নিয়েছেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। □

শতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (ডব্লু বি এম ও এ)

শতবর্ষে পদার্পণ করলো রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত অন্যতম বৃহৎ সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি, যা ডব্লু বি এম ও এ নামেও সমধিক পরিচিত। এই পরিচিতি আজ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পরিধি পেরিয়ে রাজ্যের গণআন্দোলনের সর্বত্র পরিব্যপ্ত। মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের আবৃত করে গড়ে ওঠা কোন ট্রেড ইউনয়ন সংগঠনের বহুবিধ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ওঠা-নামার মধ্যেও হাল শক্ত করে শুধু ভেসে থাকা নয়, পাল তুলে তরতর করে এগিয়ে যেতে যেতে শতবর্ষের দোর গোড়ায় পৌঁছে যাওয়া মানেই ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেওয়া এবং নিজেই ইতিহাস হয়ে ওঠা। এ বড় গর্বের সময় শুধুমাত্র ডব্লু বি এম ও এ-র সদস্য-সদস্যাদের কাছে নয়, সমগ্র রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের কাছেই। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষিতের বিচারে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক ছিল ঘটনাবহুল। এই দশকেই শুরু হয় সমগ্র পৃথিবীর বাজারকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীনই সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা গ্রন্থিতে আঘাত হানে 'দুনিয়া কাঁপানো দশটি দিন'। রাশিয়ার বুকে লেনিনের নেতৃত্বে সফলভাবে সংগঠিত হয়। মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লব — 'নভেম্বর বিপ্লব'। আত্মপ্রকাশ করে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র,--- শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের নিজস্ব রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ১৯১৮ সালে শেষ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত করার জন্য গঠিত হয় রাষ্ট্রপুঞ্জ। রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা— যে সংস্থা নভেম্বর বিপ্লব উত্তর পরিস্থিতিতে দেশে দেশে সরকারী কর্মচারীসহ শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন গড়ে তোলার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

এইসব কিছুর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনীতিতেও। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরও গুণগত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। একদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে এসে গান্ধীজী জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে 'এলিট' বৃত্ত থেকে বের করে এনে শ্রমিক-কৃষককেও যুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। অপরদিকে ঐ সময়েই নভেম্বর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এদেশেও কমিউনিস্ট আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। ১৯২০ সালে আত্মপ্রকাশ করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ঐ বছরেই গঠিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রণীত (১৯০৫) কুখ্যাত সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলসের নিগড়ে বাঁধা সরকারী কর্মচারীদের উপরোক্ত রাজনৈতিক উথাল-পাথাল প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সুযোগ ছিল না, কিন্তু শোষণ, বঞ্চনা এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির কর্মচারীদের প্রতি যে দাসসুলভ মনোভাব, তার ফলে

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির রাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির ১৯তম রাজ্য সম্মেলন (১১শ দ্বি বার্ষিক) সম্মেলন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত হলো ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি।

সম্মেলন উপলক্ষে মেদিনীপুর শহরের নামকরণ করা হয়েছিল মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রয়াত নেতা কমরেড সুকোমল সেনের নামে "সুকোমল সেন নগর" এবং মঞ্চের নামকরণ হয়েছিল সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত অমিত চট্টোপাধ্যায়ের নামে। এই সম্মেলন উপলক্ষে স্পোর্টস কমপ্লেক্স রক্ত পতাকায় সুসজ্জিত হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম দ্বি-শত বৎসর উপলক্ষে একটি পোস্টার প্রদর্শনী কমপ্লেক্সের একটি অংশ অনুষ্ঠিত হয়। কমপ্লেক্সের অপর একটি অংশে প্রগতিশীল পুস্তকের প্রদর্শনী ও বিপনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনী ও বিপনীর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক নবেন্দু হোতা।

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

সমস্যাটা ঠিক, সমাধানের রাস্তাটা ভুল

আমাদের দেশে সপ্তদশ সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে (যে ব্যবস্থা কিছু অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এবং সেই দুর্বলতাগুলিকে আরও প্রকট করার ধারাবাহিক অপচেষ্টা সত্ত্বেও বেশ শক্ত জমির ওপর টিঁকে রয়েছে), সাধারণ নির্বাচন বা লোকসভা নির্বাচন সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সংগ্রাম। কারণ এর মধ্য দিয়েই নির্ধারিত হবে, কোন্ রাজনৈতিক শক্তি বা শক্তিজোট আগামী পাঁচ বছর ভারত নামক এই যুক্তরাষ্ট্রটিকে পরিচালনা করবে। এক্ষেত্রে 'পরিচালনা' শব্দটির অতি সম্প্রতি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার শুরু হয়েছে। যদিও তা অনেক সময়েই নজরের বাইরে বা আলোচনার বাইরে থেকে যায়। এই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার অনিচ্ছাকৃত ঘটে যাওয়া কোন ত্রুটি নয়। পরিকল্পিতভাবে চালু করা একটি 'ট্রেন্ড' বা প্রবণতা।

বিষয়টি কি, তা বোঝার জন্য আমাদের দেশের সাংবিধানিক কাঠামোটির দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। সংবিধান অনুযায়ী আমাদের দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সংসদীয়, অর্থাৎ যে ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ বা আইনসভা। রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ও আইন আইন প্রণয়নের স্থান হল আইনসভা। সরকার বা প্রশাসনের দায়িত্ব আইনসভা প্রণীত এই আইনগুলিকে কার্যকরী করা। কখনও কখনও প্রশাসন বা সরকার রাষ্ট্রের জরুরী প্রয়োজনে (যা সংবিধান সম্মত) আবার কখনও কখনও প্রশাসন পরিচালনাকারী রাজনৈতিক শক্তি বা গোষ্ঠী নিজ রাজনৈতিক স্বার্থে (যা নৈতিকতার মানদণ্ডে সংবিধান সম্মত নয়) যথাক্রমে আইনসভার অধিবেশন না চলাকালীন ও আইনসভার অধিবেশন না চলার সুযোগ নিয়ে, আইনসভার অনুমোদন ব্যতিরেকে বা আইনসভাকে এড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অধ্যাদেশ বা 'অর্ডিন্যান্স' জারি করতে পারে। কিন্তু 'অধ্যাদেশ' বা 'অর্ডিন্যান্স'-র মেয়াদ সাধারণভাবে ছ'মাস। এই সময়ের মধ্যেই আইনসভার অধিবেশনে অধ্যাদেশকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। আইনসভায় অনুমোদিত না হলে, যে-কোন অধ্যাদেশ বাতিল বলে পরিগণিত হয়।

অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশ্নে আইনসভার গুরুত্ব বিপুল। আবার আইনসভার দুটি কক্ষের মধ্যে তুলনামূলকভাবে নিম্নকক্ষ অর্থাৎ লোকসভার গুরুত্ব কিছুটা হলেও বেশী (যদিও উভয়কক্ষের সদস্যদের পদমর্যাদার প্রশ্নে কোন পার্থক্য নেই)। কারণ সরকারের 'অর্থ বিল' অনুমোদনের এক্তিয়ার শুধুমাত্র লোকসভারই।

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর (সাধারণভাবে) নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এহেন গুরুত্বপূর্ণ 'লোকসভা'-র পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এবং এই নির্বাচনের কাজটা প্রত্যক্ষভাবে করেন দেশের জনসাধারণ। কেন্দ্রীয় স্তরে একমাত্র লোকসভার সদস্যরাই কিন্তু জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচিত হন। সংসদের (বিধানসভা) সদস্যদের দ্বারা। দেশের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, তা'ও ঠিক করেন নবগঠিত লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা গোষ্ঠীর সদস্যরা। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন, আমাদের দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় তারও কোনো সুযোগ নেই। এখানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায়িত্বটা পালন করেন কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্যস্তরের আইনসভাগুলির সদস্যরা যৌথভাবে। অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনে, সঠিক জনপ্রতিনিধি নির্বাচনও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং যে দায়িত্ব পালন করেন দেশের জনসাধারণ। সঠিক বিচার করার মাপকাঠিও দুটি। একটি প্রার্থীর নিজস্ব ক্রেডেন্সিয়াল এবং দ্বিতীয়টি, অতি অবশ্যই তিনি কোন রাজনৈতিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন, সেই রাজনৈতিক শক্তির জনজীবনের সমস্যাবলী সম্পর্কে বক্তব্য কি, সমাধানের কোন উপায় তাঁরা বাতলাচ্ছেন ইত্যাদি—এর থেকে একটা আভাস পাওয়া যায়, আইনসভার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়, তাঁরা কী ভূমিকা পালন করবেন। অবশ্য এটি করার জন্য শুধুমাত্র 'নির্বাচনী ইশতেহার' বা মৌখিক বিবৃতিকে বিচারের মাপকাঠি করলে ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ 'ইশতেহারে' বা ভাষণে খারাপ কথা কেউই বলেন না। জনমনোরঞ্জনের জন্য যা লেখা বা বলা দরকার, তা-ই লেখা বা বলা হয়। তাই প্রকৃত বিচারের মাপকাঠি হলো, জনস্বার্থবাহী ইস্যুগুলিকে নিয়ে মাঠে-ময়দানে, কলে-কারখানায়, জনপথে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামে কারা ব্যপৃত রয়েছেন। যদি এই মাপকাঠির বিচারে আইনসভায় জন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়, তাহলে সেই আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কণ্ঠস্বর জোরালোভাবে প্রতিফলিত হয়। যেহেতু আইনসভায় আইন প্রণয়নের প্রশ্নে 'সংখ্যা'-র পাটিগণিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই জনসাধারণের প্রকৃত কণ্ঠস্বরের সংখ্যাধিক্য জনস্বার্থবাহী আইন প্রণয়নে সরকারকে বাধ্য যেমন করতে পারে, তেমনই জনস্বার্থ বিরোধী আইন প্রণয়নের থেকে সরকারকে বিরতও করতে পারে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মূল ধারার সংবাদ মাধ্যমে নির্বাচনকেন্দ্রীক সমগ্র আলোচনায় আইনসভার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি কার্যত অনুপস্থিত থাকে, সব আলোচনাটাই কেন্দ্রীভূত হয় মূলত সরকার গড়া বা না গড়ার ওপর। সরকার গড়ার দৌড়ে কারা এগিয়ে রয়েছেন, কারা পিছিয়ে পড়ছেন—এই নিয়েই তর্কটা চলে। কিন্তু যাঁরাই সরকার গড়ুন, যে আইনসভার অনুমোদন ব্যতিরেকে তাঁরা একপাও অগ্রসর হতে পারেন না, সেই আইন সভার রাজনৈতিক 'কম্পোজিশনও' যে ততধিক গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনায় আসে না বললেই চলে। অবশ্য এই বক্তব্যের পাল্টা বক্তব্য এমন হতে পারে, লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটই তো সরকার গঠন করে। তাই সরকার গঠনের বিষয়টি আলোচনা আসা মানেই, আইনসভার রাজনৈতিক কম্পোজিশনও আলোচনায় চলে আসা। এই বক্তব্য সত্য, তবে আংশিক সত্য। আংশিক সত্য এই কারণে, সরকারে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না করে, বা সংসদে বিরোধী বেঞ্চে বসেও জনস্বার্থবাহী ভূমিকা পালন করা যায়, তার উদাহরণ সাম্প্রতিক অতীতেই রয়েছে। এম এন 'রেগা', তথ্যের অধিকার, কৃষির জন্য স্বামীনাথন কমিশন গঠন, অরণ্যের অধিকার, গার্হস্থ্য হিংসা বিরোধী আইন ইত্যাদি বর্তমানে বহু চর্চিত আইনগুলি প্রণয়নে বামপন্থীরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা তাঁরা করেছিলেন সরকারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করেই। সংসদে তাঁদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উপস্থিতির কারণেই, সরকারের বাইরে থেকেও তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে উপরোক্ত আইনগুলি প্রণয়নে বাধ্য করতে পেরেছিলেন। বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফলে খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে সর্বত্রই লড়াই করছেন, এমন রাজনৈতিক শক্তি, সংসদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উপস্থিত থাকলে, সেই সংসদ হয়ে ওঠে 'পিওপল্স্ ওরিয়েন্টেড সংসদ'। যা নির্বাচনের সময় যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ ভোট দেন, তা অনেকটাই পূরণ করতে পারে।

এতো গেল গণমাধ্যমের একটি অসম্পূর্ণ আলোচনার দিক। তবে এই অসম্পূর্ণতা না জানার কারণে নয়। হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিও নয়। এটি কর্পোরেটে পুঁজির প্রসাদধন্য মিডিয়ার সুপরিকল্পিত প্রচার পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আসলে নয়া উদারবাদের আমলে জনস্বার্থে ভূমিকা পালনের প্রশ্নে সরকারের ভূমিকা সঙ্কুচিত হয়। সরকার সক্রিয় হয়ে ওঠে কর্পোরেটে পুঁজি ও আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির স্বার্থে। জনস্বার্থে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রটি সঙ্কুচিত হয় বলে, জনস্বার্থে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ, তাকে কেন্দ্র করে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, ইস্যুগুলিকে জনপরিসরে নিয়ে আসা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয় এবং এই কারণেই সংসদের ভূমিকা, যা এই সমস্ত আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের কেন্দ্র হতে পারে, তার ভূমিকাকে লঘু করা হয়।

সরকার কেন্দ্রীক যে আলোচনার সূত্রপাত মিডিয়া করে, তাও যে খুবই বস্তুনিষ্ঠ তা কিন্তু নয়। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের আগে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, তা লক্ষ্য করলেই বিষয়টি বোঝা যায়। কেন্দ্রের বর্তমান শাসক দল, যারা গত পাঁচ বছর সরকার পরিচালনা করেছে, বর্তমানে তাঁদের জনপ্রিয়তা যে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, তা মিডিয়াও অস্বীকার করতে পারছে না। পেট্রোপণ্যসহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কৃষি, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই যে জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ার কারণ তাও তারা বলছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনে কেন্দ্রীয় শাসকদলের ভরাডুবি যে ব্যর্থতাজনিত জনরোষের ফল এই বিষয়টিও মিডিয়া আড়াল করতে পারছে না। কিন্তু তারা যা বলছে না তা হলো, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, বঞ্চনা, ক্ষোভকে সংহত করে একের পর এক আন্দোলন যারা সংগঠিত করছে, তারাই কিন্তু প্রকৃত অর্থে শাসকদলের সমর্থন ক্ষয় পাওয়া পিছনে মূল ভূমিকা পালন করছে। মিডিয়া বলছে মোদী সরকারের নির্বাচনী বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ কৃষি সঙ্কট। কিন্তু কৃষি সঙ্কটের প্রেক্ষিতে দেশজুড়ে যে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠছে, সেই আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের কথা মিডিয়া উহ্য রাখছে। এবং বিকল্প হিসেবে যাদের হাজির করা হচ্ছে, তাদের কিন্তু দেশজোড়া কৃষক আন্দোলন বা শ্রমিক আন্দোলনে কার্যত কোনো ভূমিকাই নেই। একেবারে মানানসই উদাহরণ হতে পারে অমাদের রাজ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ডাকা ধর্মঘটকে ভাঙতে যারা ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারাই আবার জোর গলায় কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছে। এই ডাক দেবার নৈতিক অধিকারই যে তাদের নেই, একথা বলার দায় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ মিডিয়ার। কারণ গণতন্ত্রের বাকি তিন স্তম্ভ (আইনসভা, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা) সঠিক ভূমিকা পালন করছে কিনা, তা দেখার দায়িত্ব মিডিয়ার। কিন্তু কর্পোরেটে পুঁজির প্রসাদধন্য মিডিয়া সেই দায়িত্ব পালনে অক্ষম। কারণ তাহলে বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্য বিপুল অর্থের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসবে, গুলিয়ে দেবার খেলাটাও জোরালো হবে। নীতি বিবর্জিত 'মুখ'কে হাজির করে বলা হবে এরাই বিকল্প। এটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করার ফাঁদ। তাই মিডিয়ার প্রচার নয়, অভিজ্ঞতাই হোক শিক্ষক। মধ্যবিত্তসহ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করুন সংসদে তাঁদের কণ্ঠস্বর জোরালো করার জন্য। □

শতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাঁদের মধ্যেও যে ক্ষোভের আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই প্রেক্ষাপটেই জেলা দায়রা ও দেওয়ানী আদালত এবং কালেক্টরেটের কর্মচারীদের নিয়ে গড়ে ওঠে বেঙ্গল মিনিস্টেরিয়াল অফিসার্স কনফারেন্স, যা অব্যবহিত পরেই বেঙ্গল মিনিস্টেরিয়াল অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন নামে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রাচীনত্বের নিরিখে বি এম ও এ গঠনের পূর্ববর্তী পর্বে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের দুটি সংগঠনের কথা জানা যায়।

একটি তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত পোস্টাল ক্লাব এবং অপরটি সরকারী ও বেসরকারী প্রেসের শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। কিন্তু শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে সম্মেলন করা সহ সাংগঠনিক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রশ্নে বেঙ্গল মিনিস্টেরিয়াল অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন ছিল অদ্বিতীয়।

১৯২৫ সালে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত সমিতির রাজ্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা বিপিনচন্দ্র পাল। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অভ্যন্তরে থেকেও, তৎকালীন বেঙ্গল মিনিস্টেরিয়াল অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন যে তাদের সাংগঠনিক কাজকে শুধুমাত্র সম্মেলন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, তার বড় প্রমাণ দুটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী— (১) বিশের দশকের শেষার্ধে বেতনভাতা সংশোধনের জন্য গঠিত 'ম্যাকঅ্যালপিন' কমিটির কাছে বেতন-ভাতার সংশোধন সংক্রান্ত সুপারিশ পেশ, (২) ১৯৪৫ সালের ৩০-৩১ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে অনুষ্ঠিত সংগঠনের রজত জয়ন্তী বর্ষ সম্মেলনে 'রাওল্যান্ড কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কারের জন্য গঠিত রাওল্যান্ড কমিটি রিজিওন্যাল কর্মচারীদের স্বার্থবাহী বেশ কিছু সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেছিল। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হল (ক) নিয়মিত ব্যবধানে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি (খ) পদোন্নতির সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন (গ) সবেতন ছুটি ও চিকিৎসা ভাতা চালু করা প্রভৃতি। এই সম্মেলন থেকেই বাংলার গভর্নর ও ভারতের গভর্নর জেনারেলকে এক তার বার্তা পাঠানো হয়— ''If no favourable response is forth coming from Government within 31st of March 1946, a special session of the conference will be convened to consider the situation.'' স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯ নভেম্বর, ১৯৪৭ কলকাতার চেতলা বয়েজ স্কুলে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলার জন্য দুটি সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সমিতির সম্পত্তিও দুভাগ করা হয়।

স্বাধীনতা উত্তর পর্বে রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনে প্রতিটি বাঁক ও মোড়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এই সমিতি। রাজ্য কর্মচারীদের যৌথ মঞ্চ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গড়ে তোলার পাশাপাশি শ্রমিক, শিক্ষক ও কর্মচারীদের যৌথ মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটি গড়ে তোলার প্রশ্নেও এই সংগঠনের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে, সর্বোপরি সত্তরের দশকের আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের কালো দিনগুলোতে এই সংগঠনের বহু নেতৃত্ব ও কর্মীর আত্মত্যাগ কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। ১৯৭৭ পরবর্তী অনুকূল পরিস্থিতিতেও কর্মচারী স্বার্থরক্ষায় এবং যৌথ আন্দোলনকে শক্তিশালী করা প্রশ্নে ডব্লু বি এম ও এ -র নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। আজ আবার পশ্চিমবাংলা জুড়ে প্রতিকূলতার কালোছায়া বিস্তার লাভ করছে। এই পরিস্থিতিতে ডব্লু বি এম ও এ -র শতবর্ষ প্রতিপালন কর্মসূচী নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়, প্রতিকূলতাকে ভেদ করেই অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের সমগ্র কর্মচারী আন্দোলনকে দিশা দেখাবে। শতবর্ষ ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পাবে। □

ত্রিপুরায় "আচ্ছে দিন" এসে গেছে

ত্রিপুরায় বামপন্থীদের সরিয়ে বিজেপির নেতৃত্বে জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে প্রায় এক বছর হতে চলল। এই সময়কালে ত্রিপুরাবাসী নানা ধরনের আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছেন। গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ এসেছে প্রবলভাবে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কার্যালয় শুধু নয় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগঠন দপ্তরও আক্রান্ত হয়েছে শাসক দলের দুর্বৃত্তবাহিনী দ্বারা। বিগত প্রায় চার দশকে যা হয়নি, অর্ধাহারে, অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাও এখন ঘটছে ত্রিপুরাতে।

অনাহারে মৃত্যু

অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাটি ছামনুর গোবিন্দ বাড়িতে। ১৮ জানুয়ারি এই অনাহারে মৃত্যুর পরও সরকার-প্রশাসন নীরব। মৃতের ছেলের শবের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। না খেতে পেয়ে মারা গেছেন জাপানদা ত্রিপুরা। মারা যাবার আগে চারদিন বাড়িতে চাল ছিল না। দুটি ছোট ভাই ছেলে মেয়ে সহ এখন সেই বাড়িতে চারজন। বছরের প্রথমে পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্য জাপানদার নাতনী প্রীতির মৃত্যু ঘটেছিল। জাপানদার ত্রিপুরার ছেলে খেলাজয় ত্রিপুরার বক্তব্য টানা চারদিন ধরে উপোস ছিল পরিবারটি। ঘরে খাবার মত কিছুই ছিল না।

সরকার স্বীকার না করলেও .... ভয়ংকর পরিস্থিতি গ্রাম-পাহাড়ে। পূর্ব ত্রিপুরার বামপন্থী সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরীর কিছুদিন আগেই বিভিন্ন এলাকা সফর করে এসে জানিয়েছিলেন, খাবারের খোঁজে বাধ্য হয়ে গরীব মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের জঙ্গলে চলে যাচ্ছেন। পরিবর্তনের স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় আসা বি জে পি-আই পি এফ টি জোট সরকার সেই কথা স্বীকার করেনি, ব্যবস্থার নেয়নি।

কংগ্রেস এবং আই পি এফ টি-র পৃথদুরি-টি ইউ জে এস জোট সরকারের আমলে খাবার চাইতে গিয়ে গুলি খেয়েছিলেন ক্ষুধার্ত মানুষ। দাসাড়োয় পুলিশের গুলিতে নিতহ হয়েছিলেন চিনতে হালাম সহ চারজন। গত ২৫ বছর এ রাজ্যে অনাহার মৃত্যুর ঘটনা একটিও নেই। আবার নিয়ে এসেছে সেই কালো দিন।

নিয়োগ বন্ধ

বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে প্রতিটি পরিবারে একজন করে কাজ পাবে; বছরে ৫০ হাজার সরকারী নিয়োগ হবে এবং স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি চালু করবে।

নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসে সরকারী বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সরকারী ক্ষেত্রে সবধরনের নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে টি পি এস সি মাধ্যমে কয়েক হাজার কর্মচারী নিয়োগের যে পক্রিয়া চালু হয়েছিল তাও বাতিল করে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২ জানুয়ারী ২০১৯ রাজ্য সরকার একটি মেমোরেন্ডাম প্রকাশ করে, তাতে বলা হয় যে শুধু কেন্দ্রীয় প্রকল্প নয়, অডিট সোর্সিং-এর মাধ্যমে সরকারী ক্ষেত্র সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও কর্মী নিয়োগ হবে। আরও বলা হয় যে এর মাধ্যমে সরকারের স্থায়ী অডিট দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি ঘটবে। বক্তব্য পরিষ্কার সরকারী নিয়োগ মানে সরকারের স্থায়ী দায়, সেই দায় নেবে না এই সরকার। কেন্দ্রের সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ত্রিপুরা সরকার—দৃষ্টিভঙ্গীর কোন ফারাক নেই।

স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি চালু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া বি জে পি সরকারে এসে অ্যাড হক কর্মচারী হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছে না। সংবাদে প্রকাশ এই অ্যাড-হক কর্মচারী হিসাবে যাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি তোয়াক্কা করছে না। সংবাদে প্রকাশ এই অ্যাড-হক কর্মচারী হিসাবে যাদের নিয়োগ করা হচ্ছে তারা আর এস এস কর্মী। এর মাধ্যমে সরকারের সমস্ত ক্যাডারে আর এস এসের অনুপ্রবেশ নিশ্চিত করা যাচ্ছে। .... হিসাবে বলা য় ১ জানুয়ারী ২০১৯ সিভিল সেক্রেটারিয়েটে .... অ্যাড-হক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিকর্মী হিসাবে। খবরে প্রকাশ এরা সবাই বিজেপির আই টি সেল-এর সাথে যুক্ত। এই নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি কোথাও। এমনকি এঁদের সেই অর্থে কোনো ইন্টারভিউ নেওয়া হয়নি। এই দশজন নিযুক্তের এখনও এসটিভুক্ত নন। অর্থাৎ নিয়োগের জেরে সংরক্ষণের নীতিও মানা হয়নি। "স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির" দাবী আসলে যে গুমলা ছিল এটা তারই প্রমাণ।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগঠন দপ্তর আক্রান্ত হয়েছে সংগঠন করার অধিকারের উপর আক্রমণ নেমে আসছে। সরকারী নির্দেশ জারি হয়েছে ১ জুন ২০১৮ তে এবং তারপরে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য এন পি এস নিউ পেনশন স্কীম কার্যকরী হবে। অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীদের অবসরের পর সামাজিক সুরক্ষা কার্যত তুলে দেওয়া হল।

এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছেন ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। টি ইউ সি সি-র নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ে পথে নামছেন সরকারী কর্মচারীরা। ত্রিপুরার জনগণের মোহভঙ্গ হচ্ছে দ্রুত। সংগ্রামে রাস্তায় সামিল হচ্ছেন তারাও। নেতৃত্বে অবশ্যই বামপন্থীরা।

জনকল্যাণের সীমানা

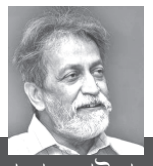

ডঃ প্রভাত পট্টনায়ক

অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট দেখে বোঝা যায়, সরকারের নির্বাচনী কৌশল হল, গরীবকে ছেড়ে মধ্যবিত্তর মন জয় করা

নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করার যে ঝোঁক অব্যাহত রয়েছে, তা শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাজেটকেও ছাড়ে নি। নতুন আর্থিক বছরে মাত্র মাস দুয়েক এই সরকারের আয়ু হওয়া সত্ত্বেও, অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশের পরিবর্তে একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হয়েছে শুধু তাই নয়, এমনকি বাজেটে বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করার ক্ষেত্রেও দৃশ্যত সরকার খুব বেশি মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টাই করেনি। আসলে, প্রকৃত অর্থেই গরীবের স্বার্থবাহী কোনো সুচিন্তিত প্রকল্প চালু করার কোনো অভিপ্রায় সরকারের ছিল না। যা ছিল, তা হলো, সস্তায় বাহবা কুড়োনোর ফন্দি।

বাজেটের তিনটে প্রধান 'ধামাকা'-র দিকে দেখা যাক। ক্ষুদ্র জোতের মালিকানা রয়েছে এমন ১২ কোটি পরিবারকে বছরে পরিবারপিছু ৬০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এই টাকার অঙ্কটি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তবে এখন সেদিকে আমরা নজর দিচ্ছি না। ঘোষিত প্রকল্পটিতে সেচসেবিত এবং সেচসেবিত নয় এমন জমির মধ্যে কোনো ফারাক করা হয়নি। মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলও খোলসা করে বলেননি যে, জমির স্বত্বাধিকারী বলতে তিনি কাদের বুঝিয়েছেন, জমির মালিক না জমিকে যারা ব্যবহার করেন তাঁরা? এমনকি জমি বলতে তিনি বাস্তু জমির কথাও বলেছেন কিনা, তা'ও বোঝা যায়নি। তবে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ধরে নিতে পারি তিনি এমন পরিবারের কথাই বলেছেন, যাদের এমন জমির মালিকানা রয়েছে, যা বাস্তুজমি নয়। এটা ঠিকই যে, এন এস এস (প্রতিবেদন ৫৭১) প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, ০.০০২ হেক্টর থেকে ২ হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিকানা রয়েছে, এমন পরিবারের সংখ্যা ২০১৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ১৩.৩ কোটি। এই সংখ্যা মন্ত্রী মহাশয় উল্লিখিত সংখ্যার কাছাকাছি। যার মানে বর্গাদার ও কৃষিমজুর উভয়কেই এই প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হলো। অর্থাৎ গরহাজির জমির মালিক এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, অথচ যাঁরা প্রকৃত কৃষক কিন্তু জমির মালিকানা নেই, তাঁরা বাদ যাবেন।

পাশাপাশি, নমুনা সমীক্ষার প্রতিবেদন থেকে ক্ষুদ্র জোতের মালিকানার সংখ্যা নিরূপণ করা এক কথা, কিন্তু সারা দেশ জুড়ে, কোটি কোটি পরিবারের মধ্যে কারো কোনো জমি নির্দিষ্ট করা অত সহজ কাজ নয়। তেলেঙ্গানায় যে 'ঋতু বন্ধু' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল, যা এই ধরনের সমস্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে, তা চালু করার আগে জমির মালিকানা সংক্রান্ত নথিপত্র নবীকরণ করা হয়েছিল। কিন্তু সারা দেশে জমি সংক্রান্ত সংরক্ষিত নথিপত্রের যে দূরাবস্থা, যা সংশোধন করার জন্য কমপক্ষে বেশ কয়েক মাস সময় লাগবে, সে ক্ষেত্রে বর্তমান আর্থিক বছরেই সম্ভাব্য উপকৃতদের কাছে প্রদেয় অর্থ পৌঁছে দেওয়া এবং তাও আবার সর্বমোট ২০,০০০ কোটি টাকা, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। বোঝাই যায়, খুব বেশি ভাবনা-চিন্তা না করেই এই প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য পেনশন প্রকল্প বলে যা ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে বর্তমান প্রবীণ শ্রমিকদের জন্য কোনো পেনশনের কথা নেই। এমনকি ন্যূনতম মজুরির অর্ধেক পেনশনের যে দীর্ঘদিনের দাবি, যার পরিমাণ দাঁড়ায় মাসিক ৫০০০ টাকা, তার পরিবর্তে যা ঘোষণা করা হয়েছে, তা হলো বর্তমানে ২৯ বছর বয়স এমন একজন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, আজ থেকে ৩০ বছর পরে মাসিক ৩০০০ টাকা পেনশন পাবেন। সর্বোপরি এটি একটি প্রদেয় মূলক প্রকল্প। মন্ত্রী গোয়েল সরকার কর্তৃক সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের কথা বললেও, তাঁর প্রদত্ত পরিসংখ্যানই সেই প্রতিশ্রুতির অসারতা প্রমাণ করেছে। যদি একজন পুরুষ শ্রমিক, যাঁর বয়স সবেমাত্র ২৯ বছর হয়েছে, যদি তিনি তাঁর ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে এই প্রকল্পে জমা দেন, তাহলে ঐ সময় পর্যন্ত তাঁর প্রদত্ত মোট অর্থের পরিমাণ হবে প্রায় ১,৫০,০০০ টাকা এবং যার ওপর ৮% হারে যৌগিক সুদ যুক্ত হবে। বর্তমানে পুরুষদের আয়ুষ্কাল গড়ে ৬৫ বছর ধরে নিয়ে বলা যায়, তিনি ৫ বছর তাঁর নিজস্ব জমা অর্থ থেকে মাসিক ৩০০০ টাকা করে পাবেন। তাহলে সরকারের সমপরিমাণ প্রদেয় অর্থ কোথায় গেল?

এক কথায়, এই প্রকল্পগুলি একটি নগদ জমা প্রকল্প। আদৌ কোনো পেনশন প্রকল্প নয়। এটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের অর্থ জমা রাখার একটি মাধ্যম হতে পারে, কিন্তু পর্যাপ্ত সরকারী অনুদানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পেনশন প্রকল্প নয়, যদিও অসংগঠিত ১০ কোটি শ্রমিক-কর্মচারী উপকৃত হবেন বলে বিস্তর হৈ চৈ করা হবে। তৃতীয় বড় ধামাকাটি হলো আয়কর সংক্রান্ত। যেখানে মূলত যে কথাটা বলা হয়েছে তা হলো, যাঁদের আয় বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, তাঁরা সম্পূর্ণ কর ছাড় পাবেন। এবং তাঁদের কোনো কর দিতে হবে না। এর ফলে অদ্ভুতভাবেই, আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণে খুব বেশি হেরফের হবে না। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে আয়করের অংশ, বর্তমান বছরের সংশোধিত হিসেবে ৬.৪ শতাংশ থেকে পরের বছরে বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৬.৬ শতাংশ।

এটি আসলে কিছুটা ওপর চালাকি; এবং কোনোভাবেই বাজেট পরিসংখ্যান থেকে কিছুই বোঝা যায় না, কারণ বিকৃত তথ্য পরিবেশনই আজকের সরকারী অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১৮-১৯ সালে জি এস টি সংগ্রহের তুলনায় এক ধাক্কায় ১ লক্ষ কোটি টাকা কমে গেলেও, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সাপেক্ষে আর্থিক ঘাটতি, এটি এমন একটি পরিসংখ্যান, যার ওপর আন্তর্জাতিক লগ্নীর নজরদারি থাকে, তার বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত হিসেবের মধ্যে কার্যত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি (৩.৪ শতাংশের পরিবর্তে ৩.৩ শতাংশ)। কোনো সন্দেহ নেই 'হর'-কে ধাক্কা মেরে ওপর দিকে তুলে জি ডি পিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোর মধ্যেই কারসাজিটা লুকিয়ে রয়েছে।

এই কথা বলার অর্থ এটা নয় যে, আর্থিক ঘাটতিকে আবশ্যিক ভাবে বেঁধে রাখার যে লগ্নী পুঁজির দৃষ্টিভঙ্গী যাকে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জোয়ান রবিনসন বলেছেন, ''লগ্নী পুঁজির দলবাজি'', তাকেই সমর্থন করা হচ্ছে। বাজেট তথ্য সহ সরকারী পরিসংখ্যানের অন্তঃসার শূন্যতা বোঝানোর জন্যই একথা বলা হলো।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এম জি এন আর ই জি এ সহ বিভিন্ন দরিদ্র মানুষের স্বার্থবাহী প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে এমনটা দেখানোর জন্য কিন্তু সরকার বিকৃত তথ্য পরিবেশনের মতো কোনো পক্ষপাতমূলক আচরণ করলো না। এম জি এন আর ই জি এ-তে বরাদ্দের পরিমাণ সামান্য হলেও ১০০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে।

গোয়েল জানিয়েছেন এম জি এন আর ই জি এ প্রকল্পে অর্থের প্রয়োজন হলে বরাদ্দ করা হবে। এই ধরনের মন্তব্য পূর্বতন অর্থ মন্ত্রীরাও করেছেন, যদিও কার্যক্ষেত্রে এই কর্মসূচীর পরিসরকে ছোটই করা হয়েছে। নীচের স্তরের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, কর্মসংস্থানের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এম জি এন আর ই জি এ প্রকল্পে বহু নাম নথিভুক্ত করা হয় না। আবর নথিভুক্তকরণের মাত্র ৬৮ শতাংশ প্রকৃত অর্থে কাজ পান।

একদিকে এম জি এন আর ই জি এ-র প্রতি যত্নের অভাব এবং প্রধানমন্ত্রী কৃষাণ সম্মান নিধি থেকে বর্গাদার ও ক্ষেত মজুরদের বাদ দেওয়া এবং অপরদিকে আয়করে ছাড় ও ২ হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিকদের (যারা সাধারণভাবে সেচ সেবিত জমির মালিক সম্পন্ন কৃষক) আর্থিক সুবিধা প্রদান, এ থেকে বোঝা যায় যে সরকারের নির্বাচনী কৌশল হলো মধ্যবর্গের মন জয় করা এবং গরীবদের দিকে না তাকানো। কিন্তু খুবই এলোমেলোভাবে বাজেটের প্রধান প্রধান প্রকল্পগুলি ঘোষণা করার ফলে, নির্বাচনী কৌশলও ধাক্কা খেতে পারে। □

অনুবাদঃ সুমিত ভট্টাচার্য

[সৌজন্যে ঃ দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯]

অন্তর্বর্তী বাজেট (২০১৯-২০)
একশো দিনের কাজে বরাদ্দ কমলো

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সংসদে পেশ করা মোদী সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটে, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের জন্য 'মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট' প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে ৬১,০০০ কোটি টাকা। যা গত অর্থবর্ষে (২০১৮-১৯) মোট বরাদ্দকৃত অর্থের (৬১,০৮৪ কোটি টাকা) তুলনায় কম।

এই প্রকল্পটি এমনিতেই বর্তমানে 'মজুরি স্থিতাবস্থায়' আক্রান্ত। গত আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে ২.৯ শতাংশ হারে মজুরি বৃদ্ধি করা হলেও, প্রকৃত অবস্থা হলো, ৩৬টির মধ্যে ২৮টি রাজ্যে এই প্রকল্পে মজুরির হার, ঐ সমস্ত রাজ্যেই স্বীকৃত ন্যূনতম মজুরির হারের তুলনায় কম। 'এম এন রেগা' প্রকল্পটি একটি চাহিদা নির্ভর প্রকল্প। স্বভাবতই এই ধরনের প্রকল্পে শুরুতেই বরাদ্দে কাট-ছাঁট করার অর্থ হলো, আগামী অর্থবর্ষের মাঝপথে মজুরি আরো হ্রাস পেতে পারে।

এপ্রিল ২০১৮-তে এই প্রকল্পের ইতিহাসে সর্বনিম্ন মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল, যখন ১০টি রাজ্যে এক পয়সাও মজুরি বাড়েনি, আর ৫টি রাজ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল দৈনিক ২ টাকা।

বামপন্থীদের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ইউ পি এ-১ সরকার ২০০৬-০৭ সালে এই প্রকল্প চালু করে। এই আইনে যে কোনো গ্রামীণ পরিবার, যারা অদক্ষ শারীরিক শ্রম প্রদানে ইচ্ছুক, তাদের বছরে ১০০ দিনের মজুরি এবং খরা ও বন্যায় ন্যায্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসলের ক্ষতি হলে, বছরে ১৫০ দিনের মজুরির কথা বলা হয়েছিল। ক্ষমতায় বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্পকে দারিদ্র দূরীকরণে কংগ্রেসের ব্যর্থতার ''জীবন্ত স্মারক'' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে পর পর দু'বার দেশীয় অর্থনীতি খরায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে, এই প্রকল্পকে বাতিল করতে পারেনি মোদী সরকার।

নোটবন্দীর পরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রগুলিতে বিপুল কর্মচ্যুতির কারণে, এই প্রকল্পে কাজের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর সাথে সাযুজ্য রেখে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেনি মোদী সরকার। □

সমাজতন্ত্রের 'ভূত' দেখছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কিন রাষ্ট্রপতির একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল, নিজের ব্যর্থতাকে আড়াল করার জন্য তিনি সবসময়েই নিপুণতার সাথে একদল 'প্রতিপক্ষ' তৈরী করেন। এই ভাবেই সম্প্রতি (৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯) মার্কিন সংসদের অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি তাঁর নতুন প্রতিপক্ষ হাজির করেছেন ঃ 'সমাজতন্ত্রী'।

ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার চক্রান্তকে সমর্থন করা ও সমাজতান্ত্রিক নীতির জন্যই ভেনেজুয়েলা আজ হতাশা ও দারিদ্রের দেশে পর্যবসিত হয়েছে—এমন মন্তব্য করার অব্যবহিত পরেই তিনি বলেছেন, ''আমাদের এই দেশ যুক্তরাষ্ট্রেও সমাজতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করার নতুন বিপজ্জনক আহ্বান শুনতে পাচ্ছি। আজ রাতে আমরা শপথ নেব, আমাদের আমেরিকা কখনই একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হবে না।''

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেমন কোন চোখে পড়ার মত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন না থাকলেও, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রতিপক্ষ ডেমোক্র্যাটদের উদার ও আক্রমণাত্মক ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং বিশেষ করে বার্নি স্যান্ডার্স ও আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও-কোর্টেজ নিজেদের গণতান্ত্রিক সমাজবাদী বলে ঘোষণা করার পরেই, ট্রাম্প সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করেছেন। শুধুমাত্র ট্রাম্পই নন, তাঁর আর্থিক উপদেষ্টারাও 'সমাজতন্ত্র'-র বিপদ নিয়ে সরব হতে শুরু করেছেন। সম্প্রতি তাঁরা একটি ৭২ পাতার প্রতিবেদন তৈরী করেছেন যেখানে অন্তত ১৪৪ বার 'সমাজতন্ত্র' কথাটি উল্লিখিত হয়েছে। 'ডেমোক্র্যাট'দের প্রস্তাবিত অবৈতনিক কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেন তা লেনিন বা মাও-সে-তুঙ্-র প্রস্তাবিত কোন নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। □ [সূত্র ঃ দ্য হিন্দু, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯]

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার প্রতিবেদন

সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বেকারী বৃদ্ধি পাচ্ছে

২০১৭-১৮ সালে সমস্ত প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বেকারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানালো জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা। এই সময়কালে বেকারী সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রাম ও শহরের শিখ ধর্মাবালম্বীদের মধ্যে (২ থেকে ৫ গুণ)। শহরাঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে এই হার হয়েছে দ্বিগুণ এবং গ্রামাঞ্চলে তিনগুণ। মুসলিম ও খৃস্টানদের মধ্যেও বেকারীর হার দ্বিগুণ। ২০১১-১২ সালের সাথে তুলনামূলকভাবে এই পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হয়েছে। সামাজিকগোষ্ঠীর নিরিখে গ্রামাঞ্চলে পুরুষদের মধ্যে বেকারী সর্বাধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তপশিলী উপজাতিদের মধ্যে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে সাধারণ অংশের মধ্যে। শহরাঞ্চলে মহিলাদের ক্ষেত্রে বেকারীর হার সর্বাধিক তপশিলী জাতি অংশের মধ্যে এবং পুরুষের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনগ্রসর অংশের মধ্যে।

ঐ সমীক্ষা সংস্থা প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী 'লেবর ফোর্স পার্টিশিপেসন্ রেট (এল এফ পি আর), সমস্ত প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পেয়েছে। লেবর ফোর্স পার্টিশিপেসন রেট হল—মোট জনসংখ্যার সাথে কোনো না কোনো কাজ করছেন, বা কাজের সন্ধানে রয়েছেন এমন মানুষের অনুপাত।

এককথায় বলা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণেই সারাদেশে সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বেকারীর হার এই সময়কালে (২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮) বৃদ্ধি পেয়েছে। □

[সূত্র ঃ দ্য বিসনেস স্ট্যান্ডার্ড, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯]

ধর্মঘটের সাফল্যকে সংহত করে বৃহত্তর সংগ্রামের লক্ষ্যে এগিয়ে চল

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

দেশব্যাপী ৮-৯ জানুয়ারির সাধারণ ধর্মঘট, দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে যুক্ত করল এক নতুন মাত্রা। বিভিন্ন রাজ্যে এবং কৃষি, শিল্প, পরিষেবার প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ মানুষ দু'দিন কাজ বন্ধ রেখে, ১২ দফা দাবীতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত জাতীয় সংবাদপত্রগুলির মতে প্রায় বিশকোটি মানুষ অংশ নিয়েছে এই সর্বভারতীয় ধর্মঘটে---যা এক নজিরবিহীন ঘটনা।

আমাদের দেশে জাতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উদারীকরণের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সাল থেকে অর্থনীতিতে নব্য উদারনীতির প্রয়োগ শুরু হয়। এই দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে চার-পাঁচজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় সরকারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁদের আমলে এই নীতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বরং ২০১৪ সালে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রে বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর এই নীতির আরও জনবিরোধী ও জাতীয় বিরোধী রূপে প্রয়োগ শুরু হয়।

নব্য উদারনীতি প্রয়োগের শুরু থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে দেশের মেহনতী জনগণ এই নীতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। এই প্রতিবাদ সংগঠিত আকারে প্রথম ধ্বনিত হয় ১৯৯১ সালের ২৯ নভেম্বর। পরবর্তীকালে এই নীতির প্রয়োগ যত তীব্র হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রাম ততটাই তীব্রতা লাভ করেছে। এই নীতির বিরুদ্ধে ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৯ সালের ৮-৯ জানুয়ারি দু'দিনের ধর্মঘট সহ ১৮টি (মোট ২০ দিন) সর্বভারতীয় ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে। এরমধ্যে দুটি দু'দিনের ধর্মঘট রয়েছে(২০১৩, ২০১৯)

প্রথমদিকে বিশেষত ১৯৯১ সালের ২৯ নভেম্বর থেকে ২০০৮ সালের ২০ আগস্ট পর্যন্ত যে ১২টি সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে, সেখানে দেশের দুই প্রধান শাসকদলের ট্রেড ইউনিয়ন অর্থাৎ কংগ্রেস পরিচালিত আই এন টি ইউ সি এবং আর এস এস পরিচালিত ভারতীয় মজদুর সংঘ (বি এম এস) অংশগ্রহণ করেনি। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারগুলির আক্রমণের তীব্রতা এতটাই ব্যাপক ছিল যে, এই দুই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব ধর্মঘটের বিরোধিতা করলেও তাদের অনুগামীরা নেতৃত্বের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ধর্মঘটে অংশ নিয়েছে। এই প্রবণতা পরবর্তীতে ক্রমশ এতটাই পরিপক্কতা অর্জন করে, যার চাপে ২০১০ সালে ৭ সেপ্টেম্বর ত্রয়োদশ ধর্মঘটে আই এন টি ইউ সি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তারপর থেকে সংগঠিত প্রতিটি সর্বভারতীয় ধর্মঘটে আই এন টি ইউ সি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। ২০১২ ও ২০১৩ সালে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সর্বভারতীয় ধর্মঘটে বি এম এস অংশ নেয়। ২০১৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর ষোড়শ ধর্মঘটের প্রস্তুতি পর্বের শেষ মুহূর্তে বি এম এস ধর্মঘট থেকে সরে দাঁড়ায়। এই ধর্মঘটের সমস্ত পর্বে বিভিন্ন আঞ্চলিক স্তরের ও রাজ্যভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন অংশগ্রহণ করেছে। এইভাবে নব্য উদারনীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে উঠেছে।

এবারের ধর্মঘটেও এই ঐক্যের চেহারাটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। যেমন এবারের ধর্মঘটের ক্ষেত্রেও ঐক্যের চেহারাটা ছিল ব্যাপক। ২৮ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত যে কনভেনশন থেকে এই দু'দিনব্যাপী ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত হয়, সেই কনভেনশনে দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং অর্ধশতাধিক সর্বভারতীয় ফেডারেশন উপস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজ্যের ও বিভিন্ন শিল্পসংস্থার চার শতাধিক ট্রেড ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন করে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় ফেডারেশনে প্রথম ধর্মঘট থেকেই সক্রিয়ভাবে ধর্মঘটে সমর্থন ও অংশগ্রহণ করেছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ধর্মঘটের এই ঐক্যবদ্ধ চেহারায় ব্যতিক্রম ছিল দুটি ট্রেড ইউনিয়ন। এর একটি হল আর এস এস পরিচালিত বি এম এস এবং দ্বিতীয়টি হল এই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত আই এন টি টি ইউ সি। এই দুই ট্রেড ইউনিয়নের বিরোধিতার চরিত্র বলা বাহুল্য রাজনৈতিক। কারণ আর এস এস-বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস, শ্রমিক স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধিতার প্রশ্নে যে একই মেরুতে অবস্থানকারী, এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে তা আরও একবার প্রমাণিত হলো।

(এক)

এবারের ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বিশ কোটি যা অতীতের সমস্ত সংখ্যাকে ছাপিয়ে গেছে। বড় বড় এগারোটি/বারোটি রাজ্যে এই ধর্মঘট ছিল ব্যাপক ও কোথাও সর্বাত্মক। পশ্চিমবাংলা, আসাম, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে ধর্মঘটের সর্বাত্মক চেহারায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্যগুলির শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। এইসব রাজ্যে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেরালা, ওড়িশা, কর্ণাটক, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে ধর্মঘটের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কেরালা, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, পাঞ্জাবসহ অধিকাংশ রাজ্যে সরকারী-বেসরকারী উভয় ধরনের পরিবহন ব্যবস্থাই ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ।

ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়ে সরকারী পরিষেবা এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে। সারা দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলিতে ব্যাপক ধর্মঘটের প্রভাব পড়ে। অধিকাংশ ডাকঘর, আয়কর বিভাগ প্রভৃতি ছিল প্রায় কর্মচারী শূন্য। ব্যাঙ্ক, বীমা পরিষেবা ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যসরকারী দপ্তরগুলির উপরও ধর্মঘটের প্রভাব ছিল ভালোই। এই ধর্মঘটে দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্র-শিক্ষকদের ধর্মঘটে অংশগ্রহণের কারণে ছিল বন্ধ।

শিল্প সংস্থাগুলিতে ধর্মঘটের প্রভাব ছিল সর্বাত্মক। ইঞ্জিনীয়ারিং, চট, চা, তথ্যপ্রযুক্তি, বিদ্যুৎ, পেট্রোকেমিক্যালস, সড়ক পরিবহন, বিমান পরিষেবা সর্বত্রই ধর্মঘটের প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছে। কয়লা খাদানের শ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করায়, খনি থেকে কয়লা উত্তোলন প্রায় পুরোপুরি বন্ধ ছিল। ধর্মঘটের দু'দিনই এন টি পি সি প্রভৃতি সংস্থা বন্ধ ছিল। নির্মাণ শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিকরা ব্যাপক সংখ্যায় ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। দু'দিনব্যাপী সর্বভারতীয় ধর্মঘটে শহরাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রাম ভারতেও ধর্মঘট ছিল সর্বাত্মক। কৃষক সংগঠনগুলি একইদিনে গ্রাম ভারত বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল।

এই রাজ্যে ধর্মঘট ভাঙবার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের পরিচালিত রাজ্য সরকার দলীয়স্তরের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের সমগ্র শক্তিকে নিয়োগ করেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত সমাজবিরোধীরা পুলিশ প্রশাসনকে সাথে নিয়ে ধর্মঘট ভাঙতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এইসব সশস্ত্র গুণ্ডারা শুধু ধর্মঘটীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে তাই নয়, স্কুল বাসে নিজেরাই হামলা চালিয়ে বশংবদ প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে তার দায় বামপন্থীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। আক্রান্ত রক্তাক্ত অবস্থাতেও ধর্মঘটী সাধারণ মানুষেরা রাস্তার দখল ছাড়েনি। মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। এই কারণেই দেখা গেছে যে, সরকার পুলিশ বা সমাজবিরোধীদের সাহায্যে কিছু সরকারী, বেসরকারী বাস চালালেও যাত্রীরা তা প্রত্যাখ্যান করায়, শেষপর্যন্ত তা বন্ধ করে দিতে হয়। একই চিত্র দেখা যায় দোকান-বাজারের ক্ষেত্রেও। সকালের দিকে তৃণমূল আশ্রিত সমাজবিরোধীদের চাপে কিছু দোকান বাজার জোর করে খোলানো হলেও ক্রেতার অভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা বন্ধ করে দিতে হয়।

প্রাক ধর্মঘট পর্বে প্রশাসনের অভ্যন্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কর্মচারী সমাজ যাতে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করতে না পারে, তারজন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অতীতের ন্যায় বেতন কাটা, ডায়াস নন এর সার্কুলার, ছুটি মঞ্জুর না করা প্রভৃতি সার্কুলার তো ছিলই। এবার নতুন একটি বিষয় যুক্ত করা হয় তাহলো ধর্মঘটীদের নাম উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের নির্দেশ। ধর্মঘটের প্রচারের অংশ হিসাবে নবান্নে কয়েকটি দাবীর সমর্থনে স্লোগান দেওয়ার অপরাধে(!) রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সহসম্পাদকদ্বয়, কোষাধ্যক্ষ, দপ্তর সম্পাদক এবং একজন সহ-সভাপতিসহ ১৮ জন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যকে গ্রেপ্তার করে শিবপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতির চাপে তাদের বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হলেও, পরের দিনই তাদের দার্জিলিং জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং মুর্শিদাবাদে বদলি করে দেওয়া হয়। কর্মচারীদের সন্ত্রস্ত করতে এবং ধর্মঘট সহ বিভিন্ন কর্মসূচী থেকে দূরে রাখতে এই সরকারী পদক্ষেপ— এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রশাসনিক সন্ত্রাসের পাশাপাশি শাসকদলের বশংবদ কর্মচারী সমর্থনপুষ্ট সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করলে বদলি, প্রমোশন বন্ধ প্রভৃতি ধরনের হুমকি প্রদর্শন করা হয়। এর পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত সমাজ বিরোধীরা বিভিন্ন অফিসে প্রবেশ করে শারীরিক আক্রমণের ভয় দেখায়। অনেক ক্ষেত্রে কর্মচারী পরিবার পরিজনরাও এই হুমকি থেকে রেহাই পায়নি। এমনকি মহিলা প্রতিবন্ধী কর্মচারীদেরও এই দুর্বৃত্তরা রেহাই দেয়নি।

এসবের পাশাপাশি চলে মহার্ঘভাতা প্রদানের তথ্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মিথ্যাচার। সকলে জানে যে ২০১৮ সালের জুনমাসে এক দলীয় অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ২০১৯ সালে ১লা জানুয়ারি থেকে রাজ্য কর্মচারীদের ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন। এই সাথে পূর্বে প্রদত্ত দশ শতাংশ অন্তবর্তী বেতনকে মহার্ঘভাতায় রূপান্তরিত করে মোট প্রাপ্ত মহার্ঘভাতার পরিমাণকে ১২৫ শতাংশ করা হয়। এছিল এক তঞ্চকতাপূর্ণ ঘোষণা যা বুঝতে কর্মচারী সমাজের অসুবিধা হয়নি। কিন্তু নিন্দনীয় বিষয় হল এই যে ছয়মাস পূর্বে ঘোষিত সিদ্ধান্তকে ঠিক ধর্মঘটের পূর্বে পুনরায় বারে বারে ঘোষণার মধ্য দিয়ে জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে পুনরায় ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা পয়লা জানুয়ারি থেকে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে নেতৃত্বের অনৈতিক বদলি ধর্মঘট বিরোধী কালা সার্কুলার, বেতন কাটা ও ডায়াস নন এর হুমকি, শাসকদলের আশ্রিত তথাকথিত কর্মচারী সংগঠনের নেতাদের এবং সমাজবিরোধীদের ভীতি প্রদর্শন, মুখ্যমন্ত্রীর মিথ্যাচার কোনও কিছুই কর্মচারী সমাজকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারেনি। বরং এই সমস্ত ঘটনা সমগ্র কর্মচারী সমাজকে সংগ্রামমুখী দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছে এবং ধর্মঘটে কর্মচারীদের সন্তোষজনক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তা সপ্রমণিতি হয়েছে। এছাড়াও নেতৃত্বের নবান্নে বিক্ষোভ প্রদর্শন, গ্রেপ্তার হওয়া, দূর দূরান্তে বদলী প্রভৃতির মধ্যেও যে দৃঢ়চেতা মনোভাব নেতৃত্ব প্রদর্শন করেছে, তার মধ্য দিয়ে কর্মচারী সমাজের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আগামী দিনে বৃহত্তর সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি হয়েছে যা কর্মচারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক উপাদান---এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দুই

নব্য উদারনীতির বিরুদ্ধে ১২ দফা দাবীর সমর্থনে অষ্টাদশ সাধারণ ধর্মঘটের এই বিরাট সাফল্যের পিছনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে—যা অবশ্যই বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে ২০১৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর সপ্তদশ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হয়। ঐ ধর্মঘটে যেসব দাবী উত্থাপিত হয়েছিল, বিগত দু'বছরের অধিক সময়ে তার কোনও মীমাংসা কেন্দ্রীয় সরকার করেনি। এমনকি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে দাবীগুলি নিয়ে আলাপ আলোচনার সৌজন্যবোধটুকু পর্যন্ত প্রদর্শন করার তাগিদটুকুও তাদের ছিল না। ফলে ২০১৬ সালের ২ সেপ্টেম্বরের পর ২০১৭ সালের ৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় কনভেনশন। এই কনভেনশন থেকে পুনরায় ধর্মঘটের দাবীগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৭ সালের ৯-১১ নভেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মহাশ্রমিক সমাবেশ থেকে ঘোষণা করা হয়, দাবী সনদের দ্রুত মীমাংসা না হলে আগামীদিনে পুনরায় ধর্মঘট সংগঠিত করা হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো হেলদোল দেখা যায়নি। ফলে ২০১৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কনভেনশন থেকে উচ্চারিত হয় অষ্টাদশ সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের ঘোষণা।

ধর্মঘটের সর্বভারতীয় ১২ দফা দাবী সনদের সাথে বিভিন্ন সংগঠন তাদের দু-একটা দফা দাবী যুক্ত করে নেয়। যেমন এই রাজ্যের কর্মচারীরা যে দু'দফা দাবী যুক্ত করে তা হল (১) বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান ও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ ও কার্যকর করা (২) ধর্মঘটের অধিকার সহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা নয়া পেনশন প্রকল্প বাতিলের দাবীটি যুক্ত করেছিল। সর্বভারতীয় দাবী সনদের পাশাপাশি নিজস্ব স্তরের দাবী দাওয়া যুক্ত হওয়ায় ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট স্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং ধর্মঘটের সাফল্যের ক্ষেত্রে এটি ছিল অন্যতম কারণ।

২০১৬ সালের ২ সেপ্টেম্বরের

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

ভারতের কৃষি সঙ্কট, উত্তরণের পথ ও কৃষক আন্দোলন

অসিত কুমার ভট্টাচার্য

ভারতের কৃষি ব্যবস্থা এক গভীর সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। ভারতের কৃষির এই সঙ্কট কৃষিক্ষেত্র, কৃষক সমাজকে ছাড়িয়ে সামাজিক সঙ্কটের চেহারা নিয়েছে। এই সঙ্কট ভারতীয় গ্রামীণ সমাজকে পুরোপুরি গ্রাস করায় কেউ কেউ একে 'সভ্যতার সঙ্কট' বলেও অভিহিত করছেন। এই সঙ্কট শুধুমাত্র জমি হারানোর নয়, জীবন-জীবিকা এবং উৎপাদনশীলতাকেও হারানো। এই সঙ্কট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ক্রমশ তলানিতে নেমে যেতে থাকা আমাদের মানসিকতাকে, বোধকে, সঙ্কুচিত করে চলে আমাদের মনুষ্যত্বকে। ভারতীয় জনগণের শতরা ৫২ ভাগ মানুষ অর্থাৎ ১২১ কোটি জনগণের (২০১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী) মধ্যে প্রায় ৬৩ কোটি মানুষ নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বস্বান্ত। তাঁদের কষ্ট, যন্ত্রণা, পীড়ন দেখেও আমরা কেমন নিশ্চিন্তে আছি! বিগত দুই দশকে তিন লক্ষের উপর আমাদের অন্নদাতা কৃষক আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন (এর মধ্যে পশ্চিমবাংলায় ২০১১ সাল থেকে আত্মহননকারী ১৯৩ জন কৃষকও আছেন)। অথচ আমাদের দেশের উচ্চকোটির 'নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদরা' চারদিকের এই ভয়াবহ সঙ্কট আর মানুষের এই মর্মভেদী যন্ত্রণাকে উপহাস করছেন।

ভারতের বর্তমান গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের বিকাশ প্রসারিত ও নিবিড়তর হয়েছে কিন্তু পুরনো আধা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে দিতে পারেনি। প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক বিন্যাস জিইয়ে রয়েছে। ভারতের মতো বিশাল দেশে বিদ্যমান ভূমি সম্পর্কের বৈচিত্র্য ও জটিলতার মধ্যে ধনতন্ত্রের বিকাশও অসম। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বৈষম্য। গ্রামীণ অর্থনীতিতে জমির উপর মালিকানার পাশাপাশি অন্যান্য কৃষি সম্পদ এবং কৃষি ও অকৃষি আয়ের কেন্দ্রীভবন আরো তীব্র হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে জমিদার, বড় পুঁজিবাদী কৃষক, ঠিকাদার, বড় ব্যবসায়ীদের নিয়ে এক গ্রামীণ ধনীদের আঁতাত গড়ে উঠছে এবং গ্রামীণ সমাজে এরাই আজ আধিপত্যকারী শ্রেণী। জমিদার ও গ্রামীণ ধনীদের এই চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেই কৃষক আন্দোলনের বিকাশ ঘটাতে হবে।

কেন্দ্রে আসীন কংগ্রেস ও তার পরবর্তী সরকারগুলির জাতীয় কৃষিনীতির লক্ষ্য ছিল সরকারী বিনিয়োগ বরাদ্দ ও সুযোগ জমিদার ও ধনী কৃষকদের পাইয়ে দেওয়া এবং জমির উপর এদের একচ্ছত্র মালিকানা অটুট রাখা, এর ফলে ব্যাঙ্ক, সমবায় প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ঋণ এরা যেমন একচেটিয়াভাবে করায়ত্ত করেছে, তেমনি ছলেবলে কৌশলে আইনের ফাঁকে শিলিং বহির্ভূত জমিসহ বিপুল পরিমাণ জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত করেছে। আর সিংহভাগ কৃষক চাষের উপকরণের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির কারণে মহাজনী ঋণের জালে জড়িয়ে এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে ক্রমাগত নিঃস্ব হয়েছেন, শেষপর্যন্ত জমি হারিয়ে ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছেন। বেছে নিয়েছেন আত্মহননের পথ।

এর সঙ্গে নব্য উদার অর্থনীতির যুগে কৃষিতে প্রবেশ করেছে কর্পোরেট পুঁজি। জমির মালিকানা থেকে দৈনন্দিন কৃষিকাজ—সবই এখন কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত। উন্নতমানের বীজ, সার থেকে রাসায়নিক, যন্ত্রপাতি সবই তারা সরবরাহ করেছে। 'মনস্যান্টো' 'রায়ার' প্রভৃতি কর্পোরেট সংস্থাগুলি গোটা কৃষি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে নেমেছে। আগাম বাণিজ্য থেকে আমদানি-রপ্তানির কারবারে বহুজাতিকদের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ দৃঢ়তর হচ্ছে। অসম বিনিময় এবং দামের মারাত্মক ওঠা-নামার মাধ্যমে কৃষকদের শোষণের তীব্রতা স্থায়ী চেহারা নিয়েছে। ফলত একদিকে কৃষিপণ্যের বিক্রেতা এবং অন্যদিকে কৃষির জন্য শিল্পপণ্যের ক্রেতা-উভয়দিক থেকে কৃষকরা প্রতারিত হচ্ছেন।

জমির একচেটিয়া মালিকানা জমিদার শ্রেণী রাষ্ট্রীয় মদতে নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছে। অধ্যাপক মহলানবিশ ১৯৬০ সালে অনুমান করেছিলেন প্রায় ৬৩ মিলিয়ন একর জমি (এক মিলিয়ন সমান—১০ লক্ষ) তৎকালীন জমির ঊর্ধ্বসীমা অনুযায়ী উদ্বৃত্ত বলে গণ্য হতে পারে। খুব বেশি হলে এই জমির এক দশমাংশ উদ্বৃত্ত বলে চিহ্নিত হয় এবং আশ্চর্য হলেও সত্যি উদ্বৃত্ত জমির অনেক কম জমি বণ্টন করা হয় (মনে রাখা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের মোট জমির ৩ শতাংশ আয়তনের জমির অধিকারী হয়েও ২৩ শতাংশ উদ্বৃত্ত ও অধিগৃহীত জমি বণ্টন করেছে)। এর ফলে কৃষি সহ গ্রামীণ সম্পদের সিংহভাগ বড় চাষী, জমিদার এবং পুঁজিপতি কৃষকদের হাতেই রয়ে গিয়েছে।

কৃষক সমস্যা নিয়ে স্বামীনাথন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী জমির মালিকানা বিন্যাসে 'ভূমিহীনরা মোট পরিবারগুলির (কৃষক) শতকরা ১১.২৪ ভাগ, যাদের হাতে কোনো জমি নেই। এক ছটাক থেকে এক একর পর্যন্ত যাদের জমি, সেই পরিবারগুলির সংখ্যা শতকরা ৪০.১১ ভাগ, কিন্তু তাঁদের হাতে রয়েছে মোট জমির মাত্র ৩.৮০ শতাংশ। এক একর থেকে আড়াই একর পর্যন্ত জমির মালিকরা মোট পরিবারের শতকরা ২০.৫২ ভাগ তাদের হাতে আছে ১৩.৩৩ শতাংশ জমি। তিনটি গোষ্ঠী মিলিয়ে আড়াই একরের কম জমির মালিক মোট পরিবারের ৭০.৮৭ শতাংশ। কিন্তু তাঁদের হাতে থাকা মোট জমির পরিমাণ মাত্র ১৬.৯ শতাংশ।' এই তথ্য বুঝতে সাহায্য করে ভারতে মোট জমির ৮৩.১ শতাংশ কুক্ষিগত আছে শতকরা ২৯.১৩ ভাগ পরিবারের হাতে। এর সঙ্গে খেয়ালে রাখতে হবে প্রতি বছর ৩ শতাংশ হারে কৃষক ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছেন। জমির এই মালিকানা বিন্যাস ভারতে কৃষি ব্যবস্থার ক্রমভঙ্গুর চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়, অন্যদিকে জমির ক্রমাগত কেন্দ্রীয়ভবন ও বাণিজ্যিকীকরণে কর্পোরেট, বিত্তবান কৃষক, দালাল ও জমি মাফিয়াদের একচেটিয়া ভূমিকার দিকে আঙুল তুলে ধরে।

কৃষি সঙ্কটের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা যায়—

(ক) বিপুল পরিমাণ কৃষি জমি প্রায় ১ কোটি হেক্টর বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে

(খ) জমিতে প্রায় সমস্ত প্রধান ফসলের উৎপাদন কমছে— তাৎপর্যপূর্ণভাবে

(গ) বিপুল সংখ্যক কৃষিজীবীদের কাছে পশুপালন ও কৃষিজ খাদ্য উৎপাদন সামর্থের অতীত হয়ে গিয়েছে।

দিল্লীতে আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর পুলিশের জলকামান

(ঘ) ১৯৯৫ থেকে ২০১৮ সময়কালের মধ্যে দেশের এক বিশাল সংখ্যক কৃষকের আত্মহননের জন্য দায়ী কৃষিক্ষেত্রে / কৃষি ব্যবসার সামগ্রিক দূরবস্থা (দেশের প্রায় ৬৭ শতাংশ কৃষক ঋণগ্রস্ত, এর মধ্যে মহাজনী ঋণের জালে বাঁধা ৫২ শতাংশ কৃষক)।

(ঙ) গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই মন্থর ভাবে বেড়েছে। বেশিরভাগ কাজ খুবই নিম্নমানের, বিধিবহির্ভূত, অমানবিক শর্তসাপেক্ষে ঘটেছে।

(চ) গ্রামীণ অর্থনৈতিক সঙ্কট সমভাবে, সমতালে সর্বত্র একইরকম ভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। অর্থকরী ফসল উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত অঞ্চলগুলিতে এই সঙ্কট তীব্র আকার নিয়েছে।

(ছ) সঙ্কট সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূলধন পুঞ্জীভূত হয়। মন্থরগতিতে হলেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে, কৃষিতে যন্ত্রপাতি বিক্রয় এবং ব্যবহারও বেড়ে চলে।

(জ) জমিহারা কৃষকের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে, জমির মালিকানা থেকে উৎখাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমি দালাল, জমি মাফিয়া, কর্পোরেট জমি গ্রাসকারী ও ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যবসায়ীরা খুব উদ্যোগী হয়ে ওঠে। কৃষিজীবী জনসংখ্যার একটি ছোট অংশ কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার্য প্রচণ্ড উৎপাদনশীল শক্তিসমূহের বৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং আর্থিক প্রাচুর্যের মাধ্যমে মূলধন পুঞ্জীভূত করে।

(ঝ) নব্য উদার অর্থনীতির দৌলতে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির ভূমিকা এবং ভারতের কৃষিতে এর প্রবল অনুপ্রবেশের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে আধিপত্য কায়েমকারী নব্য ধনিক শ্রেণী কর্পোরেট গোষ্ঠী—জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ক্ষেতমজুর, গরিব কৃষক, মাঝারি কৃষক ও গ্রামীণ অন্যান্য গরিবদের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়েছে।

(ঞ) ভারতীয় অর্থনীতির চিরস্থায়ী কাঠামোগত সঙ্কট তীব্রতর আকার নিয়ে বিরাজ করছে।

স্বাধীনতার পর কোনো কেন্দ্রীয় সরকার কৃষির সঙ্কট থেকে কৃষক সমাজকে মুক্তি দিতে কোনো ব্যবস্থ নেয়নি। রাজ্যগুলির মধ্যে কেরালা, পশ্চিমবাংলা সীমিত ক্ষমতার পরিসরে ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিকল্প নীতির ভিত্তিতে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ক্ষেতমজুর, মাঝারি কৃষকদের সমস্যা প্রশমনের আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল।

২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপি দেশের কৃষকদের জরুরী ও আশু সমস্যাগুলির সমাধানে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ২০১৭ সালে 'তখন এবং এখন' (ইউ পি এ এবং এন ডি এ) এই শিরোনামে হাজার হাজার পুস্তিকা ছেপে বিজেপি যখন রাম-রাজত্বের গুণগান গাইতে ২৫ মে-১৫ জুন (২০১৭) ভারতজুড়ে প্রচার কর্মসূচী শুরু করেছে তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় ১ জুন (২০১৭) বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের কৃষকেরা মোদী জমানার মিথ্যা প্রচারের ফানুস ফাটিয়ে হাজারে হাজারে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের তরঙ্গ সৃষ্টি করে। গোটা দেশে ৯০০টি শহরে ছোট বড় সমাবেশ, ১০ কোটি এস এম এস বার্তায় সরকারের সাফল্যের ফিরিস্তি প্রেরণ, ৪০০টি বড় বড় কাগজে ঢাউস বিজ্ঞাপন, রেডিও, দূরদর্শনে মুর্হুমুহু সাফল্যগাথার) প্রচার মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়। কৃষকদের জন্য মূল প্রতিশ্রুতিগুলি (ঋণমুকুব, উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম, কৃষির উপকরণগুলির—সেচ ও বিদ্যুতের মাশুলে ছাড় ইত্যাদি) ভঙ্গের প্রতিবাদে আন্দোলনে বিক্ষোভরত হাজার হাজার নিরীহ কৃষক জনতার উপর বিজেপি সরকারের পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়, ৬ জন কৃষক নিহত হয়। স্ফুলিঙ্গ পরিণত হল দাবানলে, মোদীজির তিন বছর পূর্তি উৎসবকে ম্লান করে দিয়ে সারা দেশে কৃষক আন্দোলনে সৃষ্টি হলো দাবানল।

এবারে আমরা সংক্ষেপে খতিয়ে দেখব বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও তার প্রতারণার হাল-হকিকত।

১। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ঃ ডঃ স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করা হবে। ডিসেম্বর ২০০৪ থেকে অক্টোবর ২০০৬ সাল—এই মেয়াদকালে ডঃ স্বামীনাথন কমিশন পাঁচটি রিপোর্ট জমা দেয় যার সুপারিশের মধ্যে 'ন্যূনতম সহায়ক মূল্যই' শুধু নয়, ছিল আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। জমির উৎপাদনশীলতা, লাভজনক উর্বরতা, স্থায়িত্ব, প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিজনিত সমস্যা, শুষ্ক ভূমিচাষ, ফসলের মূল্য সংক্রান্ত অভিঘাত এবং স্থিরতা এবং আরো অনেক কিছু। কৃষি গবেষণা এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের সর্বতোভাবে বে-সরকারীকরণকে ঠেকাতে হবে এবং আসন্ন পরিবেশগত বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে হবে। কৃষকের ন্যূনতম চাহিদা উৎপাদনের খরচের সাথে ৫০ শতাংশ লভ্যাংশ যুক্ত করে ফসলের সহায়ক মূল্য প্রদানের বিষয়টি নিয়ে সরাসরি তঞ্চকতা করা হয়েছে। ২০১৪ সালে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর ২০১৫ সালে সুপ্রিম কোর্টে এন ডি এ সরকার হলফনামা দাখিল করে জানাল স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ ও সহায়কমূল্য কার্যকরী করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, ২০১৮ সালে জুলাই মাসে বার্ষিক মূল্য ঘোষণাপর্বে কমিশনের সুপারিশ মতো ফসলের সমস্ত উপাদানগুলির খরচ হিসাব না করে মিথ্যাচার করে বলা হলো তারা কমিশনের সুপারিশ মতোই দাম ধার্য করেছেন। একটি উদাহরণ, সুপারিশ মতো ধানের সহায়ক মূল্য হয় কুইন্টাল প্রতি ২৩৪৫ টাকা অথচ কেন্দ্রের ঘোষণা অনুযায়ী ধানের সহায়কমূল্য নির্ধারিত হলো ১৭৫০ টাকা। কৃষকেরা দেখলেন তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সরকারের ঘোষণার কোনো মিল নেই।

তৃতীয়তঃ মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ'। কিন্তু মোদী সরকার ক্ষমতায় বসেই ২০১৩ সালের সংশোধিত ভূমি অধিগ্রহণ আইনে কৃষক স্বার্থবাহী যে সুযোগগুলি ছিল (উর্বর জমি দখল না করা, অধিগ্রহণের পূর্বে কৃষকের সম্মতি ও অধিগ্রহণের সামাজিক প্রভাব এবং ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসন) সেগুলিকে নস্যাৎ করে প্রায় বিনামূল্যে কৃষকের জমি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার সংশোধনী আনে। আইন করতে ব্যর্থ হওয়ায় কর্পোরেট স্বার্থে রাতারাতি অর্ডিন্যান্স জারী করে তা কার্যকরী করতে উদ্যোগী হয়। এর ফলে কৃষক সমাজের কাছে মোদী সরকারের অবস্থান দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল।

চতুর্থত, ফসল বীমা যোজনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি—তাও মিথ্যাচার আর বাগাড়ম্বরে পরিণত হলো। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার এই প্রকল্পটি চালু হয় ২০১৬ সালে। অথচ বলা হলো ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত খরিফ চাষে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা ২০১১-১৪ সালের থেকে ৫৬.৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বীমা কোম্পানিগুলির অনীহা, দীর্ঘ সূত্রিতা ও ফসলর ক্ষতি নির্ধারণের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির কারণে এই প্রকল্পের সুফল ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলি আত্মসাৎ করে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ২০১৬-১৭ সালে বীমা কোম্পানিগুলি বীমা প্রিমিয়াম বাবদ পেয়েছিল ২১৫০০ কোটি টাকা। কৃষকদের দাবি (Claims) ৪২৭০ কোটি টাকা। আর বীমা কোম্পানিগুলি দিল মাত্র ৭১৪ কোটি টাকা—মোট প্রিমিয়ামের ৩ শতাংশ মাত্র। তাতেই ছাপা কাগজ আর বৈদ্যুতিন মাধ্যমে চোখ ঝলসানো প্রচার। আবার একই প্রকল্পের কৃতিত্ব নিয়ে চলছে মোদীজী আর মমতাজীর ছায়াযুদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী নামের তালিকা জানিয়ে রাজ্য সরকার প্রকল্পের কেন্দ্রীয় অংশের বরাদ্দ নিতে অস্বীকার করেছে। আশ্চর্যের হলো কী প্রধানমন্ত্রী, কী মুখ্যমন্ত্রী—কেউই বীমার আওতায় না থাকা আলু, আখ ও অন্য রবিশষ্যগুলিকে বীমাভুক্ত করার জন্য বলছেন না।

পঞ্চমত, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯-২০ সালের অন্তর্বর্তী বাজেটে (ভোট বড় বালাই) 'প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি' নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বলা হয়েছে ২ হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিককে

▶▶ *ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে*

পেনশনার্স সমিতির রোজ্য সম্মেলন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রচুর মানুষের উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় ২ ফেব্রুয়ারি,১৯ বিকাল পাঁচটায়।

পরদিন সকাল ৯টায় প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বিশাল মিছিল মেদিনীপুর শহর পরিক্রমা করে প্রায় ৪৫ মিনিটের বেশি সময় ধরে। এই বয়স্ক মানুষদের সুসজ্জিত মিছিল শহরের সাধারণ মানুষদের চমকিত করে তোলে। মিছিল শেষে 'রক্ত' পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি শ্যামচাঁদ মণিগ্রাম। এরপর সভাপতি, অভ্যর্থনা কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুশীল ব্রহ্ম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।

সকাল ১০টায় সভাপতিমণ্ডলী

বিজয় শঙ্কর সিংহ

গঠনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সত্য বসু। প্রস্তাব উত্থাপন করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক পাঁচকড়ি নায়ক। সমিতির ৩০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান ও প্রবীণ কণ্ঠের ২৫ বছর পূর্তি উৎসব সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সহ সম্পাদক সমীক সেনগুপ্ত। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ইন্দ্রজিৎ ঘোষ।

সম্মেলনে ৫১৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ৩৮ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। এঁদের মধ্যে ৮ জন ছিলেন মহিলা। প্রতিনিধিদের আলোচনার মান ছিল বিশেষভাবে উন্নত। জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুশীল ব্রহ্ম। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ প্রিয়ব্রত সেন। আলোচনার শেষে সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদকে প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব ও প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়।

সম্মেলন থেকে শ্যামচাঁদ মনিগ্রাম, সভাপতি ও ভানুদেব চক্রবর্তী, দিলীপ বিশ্বাস, শৈলেন রায় চৌধুরী, রত্না গাজি ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে ১ম কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সত্য বসু সাধারণ সম্পাদক পাঁচকড়ি নায়ক, সমীক সেনগুপ্ত যুগ্ম সম্পাদক কাঞ্চন মুখার্জী, সুপ্রিয় রায় চৌধুরী, খগেন চক্রবর্তী সহ সম্পাদক, অসীম ব্যানার্জী দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রবীণ কণ্ঠের সম্পাদক নির্বাচিত হন বিপ্লব মুখোপাধ্যায়। □

বৃহত্তর সংগ্রামের লক্ষ্যে এগিয়ে চল

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

ধর্মঘটের পর কেন্দ্রীয় সরকারের বেশকিছু সিদ্ধান্ত শ্রমিক-কর্মচারীসহ মেহনতী জনগণের জীবনে চরম দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি করে। এর মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিল বিমুদ্রাকরণ কর্মসূচী। ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ আকস্মিকভাবে কেন্দ্রীয়সরকার পাঁচশ ও হাজার টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করে। কালো টাকা উদ্ধার, জাল নোট বাতিল, সন্ত্রাসবাদীদের কাছে অর্থ সরবরাহ বন্ধ এবং দুর্নীতি দমন, এর প্রধান উদ্দেশ্য বলা হলেও, পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে এর কোনটিই কার্যকরী হয়নি, পরন্তু অসংগঠিডত ক্ষেত্রে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছে। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বন্ধ হয়েছে। পরের বছরই নাটকীয়তার সাথে মাঝ রাতে সংসদের অধিবেশন থেকে জি এস টি চালু করার ঘোষণার পরিণতি হয়েছে একই। তাড়াহুড়ো করে এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে বিপুলসংখ্যক মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় পরিণতিতে কয়েক লক্ষ মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেলের দাম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পেট্রল, ডিজেলের ক্রমবর্ধমান মূল্য বিপুল অংশের মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতি এবং পণ্য পরিবহণ মূল্যে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এসবের মধ্য দিয়ে মেহনতী জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যায় বিপুল ইতিবাচক প্রভাব ধর্মঘটে প্রতিফলিত হয়।

দু'দিনব্যাপী এই ধর্মঘটের প্রাক্কালে দেশব্যাপী ব্যাপক গণ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল আন্দোলনগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০১৮ সালের ৯ আগস্ট দেশব্যাপী ডাক দেওয়া হয় জেল ভরো কর্মসূচী। এই আন্দোলনে দেশের ৩৯৪টি জেলায় ৬০০টি স্থানে পাঁচ লক্ষের বেশি কৃষক-শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। সারাভারত কৃষক সভার নেতৃত্বে এই কর্মসূচী আহূত হলেও, বিপুল সংখ্যায় শ্রমিক এখানে অংশগ্রহণ করে। এরপরই অনুষ্ঠিত হয় কিষাণ সংঘর্ষ র‍্যালি। এই কর্মসূচীতে দু'লক্ষের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ২৮-৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় 'কিষাণ মুক্তি পদযাত্রা'। এখানে বিপুলসংখ্যক কৃষক অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও অন্যান্য স্তরের শ্রমজীবী জনগণ নিজস্ব ক্ষেত্রের দাবীগুলি নিয়ে লড়াই করছে। এইসব লড়াই শেষপর্যন্ত ৮-৯ জানুয়ারির ধর্মঘটের সাফল্যকে নিশ্চিত করে।

ধর্মঘটের সাফল্যের প্রেক্ষিতে সে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তা হল পরিস্থিতির গুরুত্ব। বস্তুতপক্ষে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দেশবাসী চতুর্মুখ আক্রমণে আক্রান্ত। এগুলি হলো নব্য উদারনীতি, হিন্দুত্ববাদ, স্বৈরাচারী প্রবণতা এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন। এসব বিপদ পূর্বে যে ছিল না, তা নয়, কিন্তু ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তার মাত্রাগত ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। বিশেষত মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী, দারিদ্র্য ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে সরকারী বরাদ্দ ক্রমহ্রাসমান। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ, বেসরকারীকরণ, বিলুপ্তিকরণ চলছে নির্বিচারে। বৃহৎ পুঁজিপতিদের দেওয়া হচ্ছে বিপুল ছাড়। এসবের পাশাপাশি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আক্রান্ত। শ্রমআইনগুলির মালিক শ্রেণীর স্বার্থবাহী করে সংশোধিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী আক্রমণের বিরুদ্ধে যখন জনগণের ক্ষোভ এবং আন্দোলন ক্রমবর্ধমান, তখন তাকে প্রশাসনিক আক্রমণের দ্বারাই শুধু ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে তাই নয়, শ্রমিকশ্রেণী তথা মেহনতী শ্রেণীর ঐক্যকে বিনষ্ঠ করতে আর এস এস-বিজেপি জোট ধর্মীয় বিভাজনে কুৎসিত উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। এসবের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ সহযোগী রূপে ভারতকে গড়ে তুলতে নরেন্দ্র মোদী সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে দেশের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি। পরিস্থিতিগত এইসব উপাদানগুলি এবং একে কেন্দ্র করে নরেন্দ্র মোদী সরকারের অবহেলাকে কেন্দ্র করে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ সঞ্চিত হচ্ছিল। এরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ৮-৯ জানুয়ারির ধর্মঘটে। অর্থাৎ এককথায় বলা চলে যে বিষয়গত উপাদানের (সাবজেকটিভ) সহ বিষয়ীগত (সাবজেক্টিভ) পরিপক্কতাই ধর্মঘটের সাফল্যকে নিশ্চিত করেছিল।

তিন

দু'দিনব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সাফল্য যতই বিশালাকারের হোক না কেন, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে জনবিরোধী নীতির পরিবর্তন করবে, একথা ভাবা ভুল হবে। কারণ ধর্মঘটের প্রথম দিনই সংসদে ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইনের সংশোধনী পেশ করেছে মোদী সরকার। এই সংশোধনের লক্ষ্য হল শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকারহীন করা। অর্থাৎ তার সংগঠন করা, দরকষাকষি এবং ধর্মঘট করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এর দ্বারাই কেন্দ্রীয় সরকারের চরিত্র অনুধাবন করা যায়। সুতরাং আগামীদিনে আরও বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রয়োজন।

ধর্মঘটের সাফল্যকে সংগঠনের অভ্যন্তরে সংহত করা বিশেষ জরুরী। যারা প্রশাসনিক সন্ত্রাসের চাপে ধর্মঘটে অংশ নিতে পারেনি তাদের সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। আর রাজনৈতিক কারণে যারা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

যে সমস্ত কর্মচারী ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন, ধর্মঘটের প্রচার পর্বে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের গণসংগঠনের দৈনন্দিনকার কাজে যুক্ত করতে হবে। লক্ষ হবে আগামী দিনে গণসংগঠনের বিভিন্ন স্তরের সাংগঠনিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ধর্মঘটের দাবীগুলি নিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে প্রচার আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে চালাতে হবে।

এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে এরাজ্যের সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস দল জঘন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের এই ভূমিকা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, আর এস এস-বিজেপি-র সাথে এরাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো পার্থক্য নেই। বস্তুতপক্ষে ধর্মঘট ভাঙতে তৃণমূল কংগ্রেসে যা অবস্থান গ্রহণ করছে, বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি সরকারকে তা হার মানিয়ে দেয়। আগামীদিনে এই বিষয়টিকে প্রচারে নিতে হবে।

ধর্মঘটের সাফল্যকে রাজনৈতিক স্তরে সহিত করা প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হল সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক শক্তির ভারসম্যের পরিবর্তন করতে হবে। আর এই পরিবর্তনের প্রশ্নে দু'দিনব্যাপী ধর্মঘটের সাফল্যকে সংহত করতে হবে। এই লক্ষ্যে গ্রহণ করতে হবে রাজনৈতিক সাংগঠনিক আন্দোলনগত কর্মসূচী। □

ভারতের কৃষি সঙ্কট

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

বছরে ৬০০০ টাকা সহায়তা দেওয়া হবে। বছরে ৩ বার এই সহায়তা দেওয়া হবে এক্ষেত্রে বর্গাদার, খেতমজুর ও ভূমিহীন কৃষকের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে ১২ কোটি প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষি উপকৃত হবেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষক পরিবারগুলি ধরলে (২ হেক্টর পর্যন্ত) পরিবার প্রতি সহায়তার পরিমাণ হবে ১৭ টাকা।

অন্যদিকে রাজ্যসরকারও 'কৃষক বন্ধু' ('হাম কিসিসে কম নেহি') নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করেছে। এক একর পর্যন্ত কৃষক ও বর্গাদারকে বছরে ৫০০০ টাকা সহায়তা দু'বারে দেওয়া হবে খরিফ ও রবি মরশুমে। এক একরের নিচে যাদের জমি তাদের আনুপাতিক হারে সহায়তা দেওয়া হবে। এই সহায়তা ১০০০ টাকা কম হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিকারের কৃষক, বর্গাদারদের হাতে এই টাকা পৌঁছাবে তো?

ষষ্ঠত ঃ, মোদী সরকারের প্রচার ছিল, কৃষকদের আয় ৫ বছরে দ্বিগুণ হবে। দ্বিগুণ হওয়া তো দূরের কথা, নোটবন্দীর ফলে কৃষকের ফসলই বিক্রী করতে পারেনি। সহায়কমূল্য পাওয়ার জন্য কোনো পরিকাঠামো তৈরিই হয়নি। নামমাত্র মূল্যে কৃষকেরা ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। ফসল-ফলমূল-দুধ-শাকসবজি রাস্তায় ডাঁই করে ফেলে শত শত কৃষক রাজ্যগুলিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। চাপে পড়ে মোদীজী কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার প্রস্তাব ২০১৯ সাল থেকে ২০২২ সালে টেনে নিয়ে গেছেন। কম যান না আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি কৃষকদের আয় তিনগুণ হয়ে গিয়েছে বলে অবিরাম প্রচার করে চলেছেন।

সপ্তমত, মোদীজির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পকে কৃষকেরা 'মেক ইন মোজাম্বিক' বলছেন। কৃষকেরা ডালের উৎপাদন বাড়ালেও অড়হর ডালের ধার্য সহায়ক মূল্য ৫০৫০ টাকা কৃষকরা পাননি। দেশের বাজারে তাঁরা ৪০০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল দরে বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার মোজাম্বিকের সাথে যে মউ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, সেই চুক্তি অনুযায়ী ২০১৬-১৭ সালে দেশে এক লক্ষ টন অড়হর ডাল আমদানি হয়েছে। মোজাম্বিকে ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে ভালো বীজ ও প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করে ৫০৫০ টাকা কুইন্টাল প্রতি ডাল সংগ্রহ করেছে আর এখানকার কৃষকরা ঐ সহায়কমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এবার সিদ্ধান্ত হয়েছে ২০২০-২১ সালে ২ লক্ষ টন অড়হর ডাল আমদানি করা হবে। বুঝুন ঠেলা!

অষ্টমত, উদারীকরণের ফলে প্রথমে ৮২৯টি পণ্য পরে আরো ৪০০টির উপর পণ্য ঢালাও আমদানি সুযোগ খোলা হয়েছে। এর ফলে গমের উপর আমদানি কর ২৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ কমিয়ে আনা হয়েছে, আবার পেঁয়াজের মতো অর্থকরী ফসলের উপর চাপানো হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। নোটবন্দীর ফলে ইউক্রেন থেকে আমদানি করা গমের কুইন্টাল পিছু মূল্য ১২৩৯ টাকা থেকে ১৪৩১ টাকা আর দেশে গমের সহায়ক মূল্য ১৬২৫ টাকা। আর পেঁয়াজের ক্ষেত্রে সঞ্জয় শাঠে (নাসিকের কৃষক) ৯৫০ কিলোগ্রাম পেঁয়াজ ১.৪০ টাকা দরে বিক্রী করে পাওয়া টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে পাঠিয়েছেন।

নবম, নাবার্ড-এর তথ্যে দেখা যাচ্ছে শুধু পাঞ্জাবের ৩টি জেলায় ৮৬ শতাংশ কৃষক ৮০ শতাংশ ক্ষেতমজুর ঋণভারে জর্জরিত পারিবারিক কৃষির ক্ষেত্রে ১৯৯১ থেকে ২০০২-র মধ্যে আমাদের দেশে কৃষকদের ঋণ দ্বিগুণ হয়েছে। পাঞ্জাব এবং কেরালা ছাড়া কৃষকদের ঋণজাল মুক্ত করার কোনো ব্যবস্থাই রাজ্য সরকারগুলি করেনি।

কৃষকদের মোট উৎপাদনের ৩ শতাংশই সংরক্ষণের অভাবে পচে নষ্ট হয়ে যায়। ভারতীয় কৃষকরা উপভোক্তরা যা দাম দেয় তার ১০ থেকে ২৩ ভাগ মাত্র পায়।

এই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েই কৃষকরা আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কী বিদর্ভে, কী বর্ধমানে। কিন্তু শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা তা স্বীকার করেন না। ন্যাশনাল ক্রাইম রিসার্চ ব্যুরো তথ্য সংগ্রহ বন্ধ করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে আর রাজ্য সরকার তথ্য পাঠানো বন্ধ করে দেয়।

দেশের কৃষকরা আর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচারের ঢক্কানিনাদ কিংবা রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপনের মহিমায় ভুলতে রাজী নন। তাই মধ্যপ্রদেশে, রাজস্থানে, মহারাষ্ট্রে, তেলেঙ্গানায়, ঝাড়খণ্ডে, হরিয়ানায়, পাঞ্জাবে তাঁরা ঋণ মুকুবের দাবিতে, ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে, সেচ ও বিদ্যুতের দাবিতে প্রাণ দিচ্ছেন, মহারাষ্ট্রের লং মার্চে (মার্চ '১৮), রাজস্থানে সড়ক / রেলপথ অবরোধে, তেলেঙ্গানার পদযাত্রায়, সিঙ্গুর থেকে কলকাতা কিংবা উত্তরবঙ্গ অভিযানে কিষাণ সভার পতাকা নিয়ে শামিল হচ্ছেন। লড়াইয়ের এক নতুন মহাকাব্য তৈরি করছেন। মান্দাসৌরের কৃষকরা আওয়াজ তুলেছেন, 'কর্জ মাফি নয়', 'কর্জ থেকে মুক্তি'। দাবি উঠেছে স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মেনে ফসলের সহায়ক মূল্য, ভূমি সংস্কার, কৃষি উপকরণের ভর্তুকিযুক্ত দামে সহজলভ্যতা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগ, কৃষির সাথে মনরেগা প্রকল্পের সংযোগ, গ্রামে ও শহরে ন্যূনতম ২০০ দিনের কাজ, ন্যূনতম ১৮০০০ টাকা মজুরী, ষাট বছরের পর ৬০০০ টাকা পেনশন ইত্যাদি বুনিয়াদী দাবি।

মান্দাসৌরে ক্ষুব্ধ কৃষকের প্রশ্ন—সরকার ৩ কিলোমিটার অন্তর ঠেকা (মদের দোকান) খুলতে পারে (পশ্চিমবাংলায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে) তা হলে সরকার নিয়ন্ত্রিত মান্ডি খুলে রাখা যায় না? তা হলেও চাষিরা সরাসরি সহায়কমূল্যে ফসল বেচতে পারতো।

কৃষকদের এই অসন্তোষ সর্বত্র। কৃষকের প্রশ্ন কেরল সরকার কুইন্টাল পিছু ধানের দাম ২২০০ টাকায় কিনতে পারলে অন্যান্য রাজ্যে (পশ্চিমবাংলা সহ) তা সম্ভব হবে না কেন?

এখানেই শেষ নয়, চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত কৃষকেরাও মোদী জমানায় দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন। ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির সঙ্গে পশুপালনও মৎস্যচাষও কৃষিসহায়ক ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত। উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে প্রৌঢ় মহম্মদ আকলাখকে পিটিয়ে খুন করা থেকে সংখ্যালঘু ও দলিত নিধন শুরু হয়। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান হরিয়ানা, বিহার হয়ে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ও জলপাইগুড়ির ধুপগুড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত। নিহত ও আক্রান্তদের ৮৬ শতাংশই সংখ্যালঘু এবং বাকিরা দলিত, এই আক্রমণের পাশাপাশি 'প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলিটি টু অ্যানিম্যালস্ রুলস্, ২০১৭ জারি করে কৃষিকাজ ব্যতীত মহিষ সহ সকল গবাদি পশুর বিক্রী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে এই পেশায় যুক্ত কৃষকরা শুধু বিপন্ন নয় মাংস রপ্তানি ও চামড়া শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ মানুষের জীবিকা নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে, কয়েক কোটি কাজে অক্ষম গরু সংরক্ষণে কৃষকদের বাধ্য করার পরিণতিতে শুধু দুধ উৎপাদনে ভারতের অবনমন ঘটবে তাই নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশেষত মহিলারা যারা গো-পালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন তা জীবিকাচ্যুত হবেন। এর ফলে ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পড়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে সর্বব্যাপী এই সঙ্কটের বিরুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে আত্মহত্যা নয় মান্দাসৌরের কৃষক হত্যার ঘটনার পর (৬ জুন, ২০১৭) সারা ভারতবর্ষের কৃষক জনগণ এক অদৃষ্টপূর্ব গণ আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। সারা ভারত কৃষক সভার উদ্যোগে ২০০-র উপর কৃষক সংগঠন নিয়ে গড়ে উঠেছে 'সারা ভারত কিষাণ সংঘর্ষ কমিটি'। এই কমিটির নেতৃত্বে ১৭ নভেম্বর ২০১৭ সালে রাজধানী দিল্লীতে দু'দিনের বিশাল কিষাণ সংসদ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই 'কিষাণ সংসদে' ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মসূচী তুলে ধরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে দুটি বিল—ঋণমুকুব ও কৃষিপণ্যের লাভজনক দাম নিয়ে দেশব্যাপী প্রচার অভিযানের পর পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন ডাকার দাবি জানানো হবে।

এই দুই দাবি নিয়ে মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে মুম্বাই পর্যন্ত ১৮০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে প্রায় ৫০০০০ কৃষক শামিল হয়েছিলেন মার্চের ২য় সপ্তাহে। গ্রাম থেকে শহর কৃষক---সাধারণ মানুষ থেকে মধ্যবিত্ত মানুষের মৈত্রীর এক নতুন ইতিহাস তৈরি হয়েছে। এরপরে কিষাণ সভার উদ্যোগে ১০ কোটি কৃষকের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র ঋণমুকুব, ফসলের ন্যায্য দাম, জমির অধিকার, কৃষকের পেনশন, সুনিশ্চিত ফসল বীমা নিয়ে ৯ আগস্ট ২০১৮ সারা দেশের জেলা কালেক্টরের কাছে স্মারকলিপি জমা পড়েছে—কৃষকেরা শামিল হয়েছে জেল ভরো আন্দোলনে। ৫ সেপ্টেম্বর'১৮ সি আই টি ইউ, কিষাণসভা, ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের 'মজদুর কিষাণ সংঘর্ষ' সমাবেশে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'কিষাণ সংঘর্ষ' কমিটির ডাকে ২৯-৩০ নভেম্বর '১৮ 'কিষাণ মুক্তি মার্চ' দেশের বিভিন্ন প্রান্ত পরিক্রমা করে দিল্লীর রামলীলা ময়দানে যে বিশাল সমাবেশ সংগঠিত হবে, সেখানে ১৯ দফা দাবি সনদ গ্রহণ করেছে। এর পরিণতিতে 'ফার্মারস্ ফ্রিডম ফ্রম ইনডেটনেস', 'ফার্মারস্ রাইট টু গ্যারান্টেড রেমুনারেটিভ মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইলেস ফর এগ্রিকালচারাল কমোডিটি বিল '১৮ সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকে বিল দুটি অনুমোদনের জন্য গৃহীত হয়েছে। এই দাবি না মিটলে কৃষকেরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামীণ ভারতের এই জাগরণ আর কিষাণসভার আন্দোলন দেশের শাসক দলের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। পশ্চিমবাংলা সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলনে গ্রামবাংলা ক্রমশ বঞ্চনা আর প্রতারণার মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠছে। কৃষক-ক্ষেতমজুর শ্রমজীবীদের যৌথ আন্দোলনে গত জানুয়ারি'২০১৯ সারা ভারতবর্ষ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রায় ২০ কোটি মানুষ এই ধর্মঘট-হরতালে অংশ নিয়েছেন। সমস্ত আক্রমণ, দমন পীড়ন আর চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করে এই শ্রমিক-কৃষকের এই যৌথ আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত ও দুর্বার করে তুলতে হবে। তাহলে গ্রামে শহরে কায়েমী স্বার্থ, নতুন বিত্তবান শ্রেণী আর কর্পোরেট পুঁজির যে আঁতাত তাকে ভেঙে দেওয়া যাবে। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ আর সামাজিক বিভাজনের বিষচক্রকে উৎপাটন করে যাবে। ভারতবর্ষের সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ বহুত্ববাদী ঐতিহ্যকে রক্ষা করে কৃষক-শ্রমিক-জনগণ এক নতুন অধ্যায় তৈরি করবেন—ইতিহাসের এই জয়যাত্রা কেউ রুখতে পারবে না। □

অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি সমিতির রাজ্য সম্মেলন

ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ২৪তম সম্মেলন ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ডব্লিউ বি. জি. প্রেস-এর ক্যান্টিন হলে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই সমিতির রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সহসভাপতি বোমকেশ পাঁজা। শহীদ বেদীতে মাল্যদানের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন মঞ্চেপ্রথমেই গণসঙ্গীত পরিবেশন করে আলিপুর ইউনিটের সাংস্কৃতিক শাখার সদস্যবৃন্দ। সমিতির সহসভাপতি বোমকেশ পাঁজা, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকত্রয় সন্দীপ বিশ্বাস, অরুণ কর্মকার, রতন ঘোষকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সন্দীপ বিশ্বাস শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন এবং নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি সুব্রত কুমার গুহ মুদ্রিত স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমান কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অশোক পাত্র। তিনি বর্তমান প্রতিকূলতার দিকগুলিকে উল্লেখ করে এই উদ্ভূত পরিস্থিতি ভেদ করার লক্ষ্যে আগামী দিনের অপেক্ষমান সংগ্রামে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক বাবলু ঘোষ। আয় ও ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শ্রীবাস অধিকারী। প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সুমন দত্ত, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অশোক ঘোষাল।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয় ও ব্যয়ের হিসাব এবং প্রস্তাবাবলীর উপর একজন মহিলাসহ ১১ জন আলোচনা করেন। সকলের আলোচনান্তে জবাবী বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অমিত ব্যানার্জী।

সম্মেলন থেকে আগামী কার্যকালের জন্য ১৯ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি অমিত ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক বাবলু ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক সুমন দত্ত, কোষাধ্যক্ষ শ্রীবাস অধিকারী। সম্মেলনে ৯২ জন প্রতিনিধি ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। □

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ভূমি সংস্কার কর্মচারী সমিতির ৪২তম রাজ্য সম্মেলন গত ১২-১৩ জানুয়ারী, ২০১৯ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে পোস্টাল ইউনিয়ন সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শহরের নামকরণ করা হয় কমরেড সুকোমল সেন নগর এবং মঞ্চের নামকরণ করা হয় কমরেড শঙ্কর কুমার রাহা ও কমরেড গৌতম বোসের নামে।

সম্মেলনের প্রাক্কালে শ্লোগান মুখরিত লাল পাতাকায় এবং দাবি প্ল্যাকার্ডে সজ্জিত মিছিল চুঁচুড়া শহর পরিক্রমা করে সম্মেলন প্রাঙ্গণে শহীদ বেদীর সামনে উপস্থিত হয়। সমিতির রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি ধর্মদাস ঘটক। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সমিতির বর্তমান ও প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ, অভ্যর্থনা কমিটির নেতৃত্বগণ, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং সম্মেলনের উদ্বোধক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক মানস দাস।

সম্মেলনের শুরুতেই গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন হুগলী জেলার পেনশনার্স সমিতির সাংস্কৃতিক শাখার সদস্যবৃন্দ এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আরামবাগ মহকুমার সাংস্কৃতিক শাখার সদস্যবৃন্দ। সম্মেলন পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি ধর্মদাস ঘটক এবং সহসভাপতিত্রয় প্রলয় সেনগুপ্ত, অনুপ নাগ ও প্রণব রঞ্জন দত্তকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে ধর্মদাস ঘটক শোক প্রস্তাব পাঠ করেন ও সভা নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহসম্পাদক মানস দাস। তিনি বর্তমান পরিস্থিতির ইতিবাচক উপাদান সমূহকে উল্লেখ করে কর্মচারীদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেন এবং ৪২টি লাল আলো জ্বালিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক প্রণব ব্যানার্জী। দ্বি-বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ অসিত ভৌমিক। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক যশোদা রঞ্জন দাস। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুনিত অধিকারী। নিয়মাবলী সংশোধনী পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক অতনু মিত্র। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য চক্রান্তমূলক বদলীর বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক অতনু মিত্র এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অশোক পাত্র। সাম্প্রদায়িক হানাহানি বিরোধী প্রস্তাব পেশ করেন প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বাগচী।

সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন জেলার ১১০ জন প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয় ও ব্যয়ের হিসাব এবং প্রস্তাবাবলীর উপর ২৬ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদের আলোচনান্তে জবাবী বক্তব্য পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক অতনু মিত্র। সম্মেলন থেকে ৫৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় এবং ১৮ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। সম্মেলন থেকে প্রলয় সেনগুপ্তকে সভাপতি, অতনু মিত্রকে সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় প্রণব ব্যানার্জী এবং যশোদা রঞ্জন দাস, কোষাধ্যক্ষ ভবানী প্রসাদ দাস এবং দপ্তর সম্পাদক সুব্রত ব্যানার্জী নির্বাচিত হন।

সম্মেলনের আগের দিন ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক তথা কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রণব চট্টোপাধ্যায়। এই পুস্তক বিপণন কেন্দ্র অজিত ভূষণ ভট্টাচার্যের নামে নামাঙ্কিত হয়। এই বিপণী থেকে প্রতিনিধিরা ২০,৪৪২ টাকার পুস্তক ক্রয় করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন বিশেষ সংখ্যা স্মরণিকার উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদক মানস দাস। □

পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের ৪৪তম রাজ্য সম্মেলন গত ২-৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ কমরেড সুকোমল সেন সভাকক্ষে, কমরেড জ্যোতির্ময় ঘোষ মঞ্চে (কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হল) অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলন কক্ষের প্রবেশদ্বারে নির্মিত হয়েছিল স্বাস্থ্যভবন আন্দোলনের শহীদ কমরেড কাজল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত তোরণ। রক্তপতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সমিতির সভাপতি বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী সম্মেলনের সূচনা করেন। এরপর শহীদবেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অমর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সম্মেলনের শুরুতে সমিতি ও ভ্রাতৃপ্রতীম সমিতিগুলের সাংস্কৃতিক শিল্পীরা গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। উপস্থিত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান পার্থ ঘোষ। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ সম্পাদক মানস দাস। উদ্বোধনী বক্তব্যে মানস দাস বর্তমান রাজ্য সরকার কর্তৃক কর্মচারীদের প্রতি আর্থিক বঞ্চনা, পে-কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি সহ কর্মচারীদের সংগঠন করার অধিকার, ধর্মঘট করার অধিকার হরণ ও প্রতিবাদী নেতৃত্বের প্রতিহিংসামূলক বদলীর অমানবিক দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরেন এবং এর বিরুদ্ধে কর্মচারীদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধ লড়াইকে তীব্রতর করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে—এই বিষয়টিও প্রতিনিধিদের অবহিত করেন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম-সম্পাদক সৌমিত্র পাত্র। বিগত দু'বছরের নিরীক্ষিত আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ মিলন চক্রবর্তী। খসড়া দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন অপর যুগ্ম সম্পাদক শিলাদিত্য মোহরার এবং সমর্থন করেন সহ সম্পাদক তরুণ দত্ত। খসড়া গঠনতন্ত্রের সংশোধনী পেশ করেন মুখপত্র 'শরিক'-এর চেয়ারম্যান অসীম পাল এবং সমর্থন করেন অপর সহসম্পাদক শাশ্বতবন্ধু মুখার্জী।

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বুক স্টল উদ্বোদন এবং বিশেষ সংখ্যা 'শরিক' প্রকাশ করেন অধ্যাপক সুবিমল সেন এবং তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সমিতির পাঠাগারে (কম. সুকোমল সেন স্মৃতি পাঠাগার) পুস্তক ক্রয়ের জন্য ২৫ হাজার টাকা প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে দেশের সাম্প্রদায়িকতার বিপদ এবং এই বিপদ থেকে মুক্তির জন্য শ্রমজীবীদের সচেতন সংগ্রামের বিষয়টি তুলে ধরেন। আগামী সংগ্রামের লক্ষ্যে দাবী সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করেন সমিতির নেতৃত্ব এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য আশীষ ভট্টাচার্য এবং সমর্থন করেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অসিত ভট্টাচার্য। উভয় বক্তাই কেন্দ্রীয় স্তরে, রাজ্যস্তরে এবং সমিতিগতভাবে দাবি উত্থাপন ও অর্জনের সংগ্রাম সংগঠিত করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেন।

সম্মেলনে ২৬ জন মহিলা সহ ২৪৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং ৪ জন মহিলাসহ মোট ২৮ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশাসনিক আক্রমণকে প্রতিহত করে বৃহত্তর টাকা স্থাপনের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকার রক্ষা ও বকেয়া দাবি অর্জনের শপথ গ্রহণ করেছেন প্রত্যেক আলোচক। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা মোট ২১,৩৭৮/- (কমিশন সহ ২৮,৫০৪/-) টাকার পুস্তক ক্রয় করেন। জবাবী ভাষণে সাধারণ সম্পাদক নিখিলরঞ্জন পাত্র বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর প্রশাসনে এবং প্রশাসকদের কড়া নজরদারীর মধ্যে কর্মীবাহিনী যেভাবে সংগঠনের সমস্ত কাঠামোকে সক্রিয় করে রেখেছেন, তার জন্য সংগ্রামী অভিনন্দন জানান এবং আগামী দিনে বকেয়া দাবি অর্জনের জন্য আপোষহীন সংগ্রামের ডাক দেন।

আগামী কার্যকালের জন্য সভাপতি শাশ্বত বন্ধু মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদক নিখিলরঞ্জন পাত্র, যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয় সৌমিত্র পাত্র ও শিলাদিত্য মোহরার, দপ্তর সম্পাদক পার্থ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ অমূল্য রায়চৌধুরী, মুখপত্রের চেয়ারম্যান দিলীপ দত্তগুপ্ত এবং ৮ জন আমন্ত্রিতসহ মোট ৩০ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়। □

শোক সংবাদ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৯ জানুয়ারী শনিবার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে কলকাতার এক হাসপাতালে প্রয়াত হন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪।

জন্ম ১৯৩৪ সালে অবিভক্ত বাংলার ঢাকা শহরে। দেশ ভাগের পর কলকাতায় চলে আসেন। কলেজে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষার পর বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। কখনও নাবিক, কখনও প্রাথমিক শিক্ষক, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, কারখানার ম্যানেজার, সাংবাদিক, প্রকাশনা সংস্থার ব্যবস্থাপক। দেশভাগের যন্ত্রণা সারা জীবন তার মনকে প্রভাবিত করেছে ও তাঁর লেখনীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তেমনি বিভিন্ন ধরনের পেশার মাধ্যমে জীবন সংগ্রামের কথা তার লেখার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে এবং বাংলার গ্রাম্য জীবনের বাস্তব চিত্র তিনি এঁকেছেন। তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় মুর্শিদাবাদের একটি লিটল ম্যাগাজিনে। বহু রচনার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। চার খণ্ডের এই উপন্যাস তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। এই চার খণ্ড উপন্যাসে অবিভক্ত বাংলা ও দেশভাগের যন্ত্রণা, সামাজিক ভাঙন নিপুণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তাঁর এই উপন্যাস বাংলার কথাসাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। তার এই লেখনীর সাথে তুলনা করা হয় বিভূতিভূষণের রচনা শৈলীর সাথে।

দেশভাগকে কেন্দ্র করে তিনটি বিখ্যাত উপন্যাস তিনি লেখেন, 'মানুষের ঘর বাড়ি', 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান'।

তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে আছে, 'মানিকলালের জীবনচরিত', 'বিদেশিনী', 'বর্ণমালা', 'মা আমার', 'সাদা জ্যোৎস্না' ইত্যাদি। শিশু সাহিত্য তিনি রচনা করেছেন সেই তালিকায় রয়েছে 'উড়ন্ত তরবারি', 'গিনি রহস্য', 'পালকের টুপি', 'নীল তিমি' ইত্যাদি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৯৮ সালে পেয়েছিলেন বঙ্কিম পুরস্কার। এছাড়া পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। □

প্রধানমন্ত্রীকে সর্বভারতীয় সংগঠনের পত্র

AISGEF

ALL INDIA
STATE GOVERNMENT EMPLOYEES FEDERATION
Affiliated to the TUI (Public Services)

T C No. 81/425, Gandhari Ammankovil Street, Thiruvananthapuram – 695 001 INDIA
Fax: 0471 – 2330649 Ph: 0471 – 2330649 email: aisgefgs@gmail.com

Chairman: Subhash Lamba
General Secretary: A Sreekumar

No. 68/AISGEF/HQ **Dated, 21st January, 2019.**

To

The Hon'ble Prime Minister,
Government of India,
South Block, Raisina Hill,
New Delhi-110011
Fax-23016857

Respected Sir,

Sub: Demands by Government Employees and Teachers – Reg.
Ref: Nil.

I request that the following immediate issues of Government employees and Teachers may please be addressed in the Budget for 2019-2020:

1. Annul Pension Fund Regulatory Authority Act, 2013. Abandon Contributory Pension System. Enrol all employees and Teachers under the National Pension Scheme to the Defined Benefit Pension System as the NPS is totally against the interest of the employees working in various sectors;
2. Issue necessary orders to regularise all contractual employees. Issue necessary directions to stop Out Sourcing, Contractual Employment and Daily Waged appointment in various Government Services. Ensure that all appointments should be through legitimate agencies;
3. Enhance the ceiling of Income Tax to Rs. 10,00,000/- considering the cost of living;
4. The interest rate of General Provident Fund may be enhanced to 9%;
5. Fix a minimum wage of Rs. 18,000/- for all workers including Schemes workers and Part time workers.

With regards,

Yours faithfully,
A SREEKUMAR
General Secretary

ALL INDIA STATE GOVT. EMPLOYEES FEDERATION Date

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন কর্মসূচী

▶▶ *অষ্টম পৃষ্ঠার পর*

পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের দারুণ আনন্দিত ও উৎসাহিত করেছে।

এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের শরিক শ্রী তরুণ মজুমদার। দু'দিন ব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংগঠিত আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ, যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী, সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য, কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রণব চট্টোপাধ্যায় ও প্রবীর মুখার্জী। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অসীম ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর ড. উদয়ভানু গাঙ্গুলী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের নেত্রী গীতশ্রী সরকার প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লালগড়ের শহীদ শালকু সোরেনের মা ছিদামনী সোরেন। তাঁকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয় ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি পারমিতা মুখার্জী, শ্রীমতি বিদীপ্তা চক্রবর্তী এবং শ্রী শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার। বিশিষ্ট অভিনেতা রজতাভ দত্ত ও সৌমিত্র বসু মঞ্চস্থ করেন নাট্যশালা প্রযোজিত নাটক 'সোক্রাতেস'। এছাড়াও প্রবন্ধ প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। সংগঠনের মুখপত্র আলোর পথে বিশেষ সংখ্যার উদ্বোধন করেন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
47th Year, 9th Issue, January 2019

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

চিটফান্ড কেলেঙ্কারির জল ক্রমশ গড়াচ্ছে...

দেবাশিস রায়

চিটফাণ্ড নিয়ে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এ রাজ্যে সর্ববৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারী ঘটেছে বর্তমান রাজ্য সরকারের শাসনকালে 'সারদা' ও অন্যান্য চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারিতে প্রতারিত হচ্ছেন প্রায় এককোটিমানষ যার বেশীরভাগই গরিব ও নিম্নবিত্ত উধাও হয়ে গেচে ২৫ হাজার কোটি টাকারও বেশী। ২০১৩ সালে চিটফাণ্ড বুদবুদ ফেটে যাওয়ার পরে এযাবৎ পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ৯৩ জন প্রতারিত, আক্রমণকারী এজেন্ট আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। আমানতকারীদের তাড়ায় ঘরছাড়া হয়ে দিন কাটাচ্ছেন কয়েকশো এজেন্ট।

২০১৩ সালের জানুয়ারী মাসে পনজি স্কিমের অর্থনৈতিক নিয়মে ধস নামে সারদা চিটখাণ্ডে ফলস্বরূপ মার্চ ২০১৩ থেকে এপ্রিল ২০১৩-র মধ্যে বন্ধ হলো সারদা চিটফাণ্ডের টাকায় পরিচালিত এক ডজনের বেশি সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও টিভি চ্যানেল। ২২ এপ্রিল মহাকরণে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বললেন 'যা গেছে তা গেছে'। পরবর্তীতে টাকা ফেরানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেনের নেতৃত্বে কমিশন এবং বিশেষ তদন্তকারী দল সি গঠন করেন। অদ্ভুতভাবে সারদার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেখান থেকে প্রতারিত সাধারণ মানষদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বদলে সরকারী তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে দাবী করা হয় সারদা চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারির সঙ্গে বর্তমান রাজ্য সরকার যে রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত তার নেতা-নেত্রী- মন্ত্রী-সাংসদরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন এই আর্থিক কেলেঙ্কারির বিষয়টি সামনে আসে তখন এই চিটফাণ্ডের টাকা এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা বদলে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রথমে কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিরোধীদের বক্তব্য বিচার বিভাগীয় কমিশন ও 'বিশেষ' পুলিশী তদন্ত দল (সিট) গঠনের আসল উদ্দেশ্য ছিল প্রতারকদের আড়াল করা। পরবর্তীতে রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন একটা সামান্য অংশের মানুষকে ক্ষতিপূরণ দিয়েই রাজ্য সরকার তার দায় সারলেন। পরবর্তীতে রাজ্য সরকার নিজেই বিচার বিভাগীয় কমিশন তুলে দেয়। এমনকি কমিশনের রিপোর্টও রাজ্য সরকার আজ পর্যন্ত প্রকাশ করেনি। বিরোধী দল বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে তাদের বিধায়করা ২০১২ সালের ১১ ডিসেম্বর বিধানসভায় সারদা প্রসঙ্গ তোলার পর শাসকদলের হাতে বিধানসভার কক্ষেই প্রহৃদ হন। বিরোধীদের আরো বক্তব্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বারবার বলা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার কোনো পদক্ষপে গ্রহণ করেনি। পুরোনো আইনে ব্যবস্থা গ্রহণে সমস্যা আছে বলে চিটফাণ্ড সংক্রান্ত নতুন আইন পাশ করাতে অহেতুক সময় নষ্টের অভিযোগও বিরোধীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সারদা চিটফাণ্ডের ফানুস ফাটতে শর করে এজেন্ট ও আমানতকারীদের তৃণমূল ভবন ও মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে। রাজ্যজুড়ে প্রতারিত আমানতকারী ও এজেন্টরা সর্বস্বান্ত হয়ে যখন প্রশাসনের সাহায্যপ্রার্থী তখন প্রশাসনিকপ্রধানের কাছ থেকে 'যা গেছে তা গেছে'---শুনে হতবাক হয়ে গেছিলেন। সাধারণ মানুষ এবং বিরোধীদের পক্ষ থেকে সিবিআই তদন্তে দাবী উঠছে তখন রাজ্য সরকার সিট গঠন করে। সারদার কর্ণধার সুদীপ্ত সেন সিবিআই-এর উদ্দেশ্যে ১৮ পাতার চিঠি লিখে '২০১৩তে উধাও হয়ে যান। পরবর্তীতে পুলিশ তাকে দুই সঙ্গীসহ ধরে আনল কাশ্মীরের সোনমার্গ থেকে। ধৃত সুদীপ্ত সেন ফিরে এসে বললেন, সিবিআই তদন্তের দরকার নেই, রাজ্য পুলিশ (সিট) ভালো তদন্ত করছে অর্থাৎ যে রাজ্যের সাধারণ মানুষের অর্থ লুঠের প্রধান প্রতারক তিনি মতামত দিচ্ছেন তার বিচার কে করবে। ইতিমধ্যে রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করে শাসকদলের টিকিটে রাজ্যসভায়

নির্বাচিত সাংসদদ কুনাল ঘোষকে সারদা চিটফান্ড কাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে ২০১৩ সালের ২৩ নভেম্বর। তার আগেস কুনাল ঘোষ দল থেকে সাসপেন্ড করা হয় কারণ তিনি সারদার বেআইনী অর্থ লগ্নীর সঙ্গে রাজ্যের শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বের যোগসাজশ নিয়ে প্রকাশ্যে বেশ কয়েকবার মুখ খোলেন। কুনাল ঘোষকে দীর্ঘদিন জেলে কাটাতে হয়। ২০১৪ সালে মে মাসে চিটফাণ্ড কাণ্ডের বৃহত্তর ষড়যন্ত্র উন্মোচন করতে সিবিআই-এর নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সিবিআই-এর তত্ত্বাবধানে তদন্ত আটকানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী সরকারী তহবিল থেকে ১১ কোটি টাকা খরচ করা হয়, তবুও সিবিআই তদন্ত আটকানো যায়নি। এর মাঝে ঘটে যায় বেশকিছু ঘটনা যার মধ্য দিয়ে শাসকদল এবং চিটফান্ডের মধ্যকার ওতপ্রোত যোগাযোগের বিরোধী। দাবী অনেকটাই প্রতিষ্ঠা পায়। চিটফান্ডের কেলেঙ্কারির তথ্যের ওপরে দখলদারি কে নেবে তা নিয়ে ই ডি এবং ইনকাম ট্যাক্স অফিসারদের সঙ্গে বিরোধে জড়ায় রাজ্য পুলিশ। সারদা চিটফান্ড সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য কব্জায় নেয় রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল সিট এবং সি বি আই ও অন্যান্য তদন্তকারী কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে কোনো সহায়তা করতে তারা অস্বীকার করে বলে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির দাবী। এমনকি মামলা চলাকালীন আদালত কক্ষে সি বি আই আইনজীবীকে সওয়ালে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে। ২০১৪ সালের ২১ নভেম্বর গ্রেপ্তার হন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সৃঞ্জয় বসু। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী তিনি জামিন পান এবং তারপরই রাজনীতি ছাড়ার কথার ঘোষণা করেন। তদন্ত এগনোর পরেই সি বি আই ২০১৪ সালে ১২ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্রকে। গ্রেপ্তার হওার পর দীর্ঘদিন তিনি জেলে থাকা অবস্থায়ই সরকারের মন্ত্রীপদে আসীন ছিলেন, পরবর্তীতে প্রভাবশা তকমা ঘোচাতে তিনি মন্ত্রীত্ব পদে ইস্তাফা দেন। বর্তমানে তিনি জামিতে মুক্ত রয়েছেন। ২০১৪ সালে ৯ সেপ্টেম্বর সারদাকাণ্ডে সি বি আই গ্রেপ্তার করেছিল শাসকদলের সহ সভাপতি এবং প্রাক্তন আই পি এস অফিসার রতজ মজুমদার। রজত মজুমদার সারদা গোষ্ঠীর 'নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপদেষ্টা' ছিলেন। ২০১৫ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারী তিনি জামিন পান। সারদা কাণ্ডে এছাড়াও গ্রেপ্তার হয়েছেন শাসক দলের সাংসদ তাপস পাল, বর্ষীয়ান সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম উঠে এসেছে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। এছাড়াও অর্পিতা ঘোষ, আহমেদ হাসান ইমরান। সে সময়ের বস্ত্রমন্ত্রী শ্যামাপদ মুখার্জীকেও সারদা কাণ্ডে তদন্তে ডেকে পাঠিয়ে জেরা করে সি বি আই। ২০১৫ সালে ৩০ জানুয়ারী সি বি আই জেরা তৃণমূল কংগ্রেসের তৎকালনী সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্যসভার সদস্য মুকুল রায়কে। যিনি সে সময়ে শাসক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। এই জেরা চলাকালীন মুকুল রায় স্বীকার করেন (পরে প্রকাশ্যে স্বীকার করেন) কালিম্পংয়ের জেলাতে সরকারী অতিথি শালায় ২০১২ সালে মার্চ মাসে গভীররাত্রে সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। মুকুল রায় পরবর্তীতে দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দেন শুধুমাত্র সারদার সুদীপ্ত সেন নয় আরেকটি চিটফান্ড সংস্থার মালিক রোজভ্যালি কর্তা গৌতম কুন্ডুর সঙ্গেও জেলার সরকারী অতিথিশালায় বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একথা গৌতম কুন্ডু নিজেই কলকাতায় সাংবাদিকদের কাছ স্বীকার করেন বিগত ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তে। শুধু সারদা বা রোজভ্যালির মাধ্যমে প্রতাররণা নয় এর সঙ্গে আরও কয়েকটি চিটফান্ডের মাধ্যমে আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে যাদের ক্ষেত্রে বারে বারে শাসকদলের নেতা-নেত্রীদের উঠে আসছে। এরকমই একটি চিটফান্ডের মালিক হরিয়ানার কে ডি সিং, হরিয়ানার ব্যবসায়ী আবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদও বটে। তার চিটফান্ড সংস্থা অ্যালকেমিস্টের মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মস্মাতের অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। চিটফান্ড মোকাবিলায় বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলের কঠোর ধারা সংবলিত বিলকে শিকেয় তুলে বহু ঢক্কানিনাদ করে বর্তমান রাজ্য সরকার ২০১৩-র ৩০ এপ্রিল একটি বিল পাশ করে। সেই বিলের যে যে ধারা সংবিধান বিরোধী বলে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাকে নস্যাৎ করে বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালেও তা ফেরত আসে। পরবর্তীতে বিগত ১৮ জুন ২০১৫ শেষ পর্যন্ত 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোটেকশন অফ ডিপোজিটারস ইন ফিনান্সিয়াল এসটাবলিমেন্টস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০১৫' রাজ্য বিধানসভায় পাশ করায় বর্তমান সরকার। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছিল চিট ফান্ড মোকাবিলায় তারা কঠোর আইন করবে। বিরোধীদের বক্তব্য বাস্তবে হলো একটি শিথিল আইন। একই সঙ্গে বিরোধীদের অভিযোগ চিটফান্ড কেলেঙ্কারীতে সর্বস্বান্ত মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর বদলে প্রতারকদের আড়াল করতে বর্তমান প্রশাসন বেশী উদ্যোগ নিচ্ছে। বিগত ৩ ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করলেন এক অভাবনীয় ঘটনা। সন্ধ্যাবেলা সমস্ত বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে আমরা জানতে পারলাম রাজ্য সরকার গঠিত সিট-এর প্রধান এবং বর্তমানে কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার-কে সি বি আই জিজ্ঞাসাবাদে করতে তার বাড়িতে গেলে রাজ্য সরকারের পুলিশ সি বি আই আধিকারিকদের নজীরবিহীনভাবে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তাদের ছেড়ে দেওয়া হলেও এ ঘটনার মধ্য দিয়ে বহু প্রশ্ন উঠে আসছে। সি বি আই-এর বক্তব্য তারা চারবার রাজীব কুমারকে জেরা করার নোটিশ পাঠালেও তিনি তা এড়িয়ে গেছেন। এদিনও তিনি সহযোগিতা করতে অস্বীকারই শুধু করেননি, সি বি আই আধিকারিকদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত-ও হতে হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছে যান কলকাতা পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে এবং সেখান থেকে তিনি কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে এসে নিজে ধর্নায় বসেন কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে যেখানে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে তাঁরই সরকার। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছে এবং তারা প্রশ্ন তুলেছে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের এরকম পদক্ষেপ গ্রহণ সংবিধান সম্মত কি না? বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ঐতিহাসিক ব্রিগেড সমাবেশের সাফল্য থেকে জনমানসের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই ওই দিনের এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পাশে দাঁড়ান তারই সরকারের একজন আধিকারিক হিসাবে তখন আমাদের মধ্যে প্রশ্ন আসে নির্বাচন কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে খুন হওয়া শিক্ষক রাজকুমার রায়ওতো এই রাজ্য সরকারের শিক্ষক বিভিন্ন হাসপাতালে প্রহৃতত হওয়া কর্তব্যরত ডাক্তার-নার্সরা তো এই রাজ্য সরকারেরই স্বাস্থ্য পরিষেবার অপরিহার্য অংশ।

নবান্নতে স্লোগান দেওয়ার অপরাধে দূরদূরান্তে বদলী হওয়া আমাদের ১৫ জন নেতা-নেত্রীও তো এই রাজ্য সরকারেরই প্রশাসনের অঙ্গ, কেউই অপরাধী নন তাহলে রাজীব কুমারের ক্ষেত্রে এই বাড়তি উদ্যোগ এই প্রশ্নকেই সামনে নিয়ে আসছে যে শাসকদলকে বাঁচাতে রাজ্য সরকার গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) চিটফান্ড সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নষ্ট করে ফেলেছে—বিরোধী তথা সি বি আই-ইডির এই দাবীর সারবতা থাকলেও থাকতে পারে। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসট্যান্টস্ এ্যাসোসিয়েশন

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন কর্মসূচী

তরুণ মজুমদার

বিদীপ্তা চক্রবর্তী

ছিদামনী সোরেন

গীতশ্রী সরকার

গত ২৩-২৪ নভেম্বর ২০১৮, কলকাতার মৌলালী যুবকেন্দ্রে সমিতির দু'দিন ব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণ, সমিতির মুখপত্রের প্রকাশনা ও মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর প্রভৃতি বহুমাত্রিক কর্মসূচী কর্মচারী ও তাঁদের

সপ্তম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি

পত্রাঙ্ক ঃ ১৮৭/পেন-২৩/সমিতি-২০
তারিখ ঃ ০৮-০২-২০১৯
মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মাননীয়া মহাশয়া,

পশ্চিমবঙ্গের পেনশনার-ফ্যামিলি পেনশনারদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি পেনশনার-ফ্যামিলি পেনশনারদের জীবনযন্ত্রণা এবং তৎজনিত ক্ষোভের বিষয় আপনার গোচরে আনতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক ঘোষণায় রাজ্য বেতন কমিশনের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করেছিলেন। যার ফলে পে-কমিশনের মোট মেয়াদ ৩ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীসহ সারা রাজ্যের পেনশনার-ফ্যামিলি পেনশনাররা যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েই প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন।

বর্তমানে রাজ্য বাজেট বিধানসভায় গৃহীত হওয়ার পর আমরা বিস্ময়ে লক্ষ্য করছি যে পে-কমিশন রূপায়ণ বা রাজ্য কর্মচারী ও পেনশনারদের বেতন-ভাতা খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। তাছাড়া শ্রমিক, কৃষক-বেকার যুবক সহ সমাজের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অংশের জন্য যেটুকু সামাজিক সুরক্ষা ছিল তাও হ্রাস করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় সারা রাজ্যের পেনশনারদের ফ্যামিলি পেনশনারদের প্রতিনিধিত্বকারি সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির পক্ষ থেকে আমি রাজ্য সরকারের এই বঞ্চনা-প্রতারণার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

অবিলম্বে পে-কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ এবং সকলের স্বার্থে তার রূপায়ণের জন্য প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে ব্যয় বরাদ্দের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে

ভবদীয়—
সংগ্রামী অভিনন্দন সহ
স্বাঃ সত্য বসু
সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।